আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে

শেখ হাসিনা



মূল ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ : বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার সৌজন্যে

প্রকাশক
মিলন নাথ
অনুপম প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০০১
ফাল্গুন ১৪০৭

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
সূচনা কম্পিউটার্স
৪০/৪১ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
এস আর প্রিন্টিং প্রেস
৭ শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্য
৫০·০০ টাকা

ISBN 984—404—180—5

ANTARJATIK SAMPARKA UNNAYANE SHEIKH HASINA (A Callection of Speeches about International Relationship, Peace & Development).
Published by Milan Nath. Anupam Prakashani
38/4 Banglabazar Dhaka-1100.

Price Tk. 50.00 Foreign US$ 3.

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দূরদর্শীপূর্ণ সরকার প্রধান হিসেবে বিশ্বনেতৃত্বের আসনে আজ প্রতিষ্ঠিত। তাঁর আদর্শবাদী চিন্তা ভাবনা, কল্যাণমুখী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক উদ্যোগ বিশ্বব্যাপী আজ সকল মহলে প্রসংশিত হচ্ছে। এশিয়ার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, বিশ্বস্ত বন্ধু এবং অনন্য সংগ্রামী নেত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা আজ দায়িত্বশীল ভূমিকাও পালন করে চলেছেন। তাঁর নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগী প্রতিকৃতি আমাদের গভীরভাবে আকর্ষণ করে।

আমরা তাঁর জাতিসংঘ ও নিরাপত্তা পরিষদে দেয়া ভাষণগুলিতে দেখি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, অবৈধ উপায়ে ক্ষমতা দখল, সামরিক শাসন জারি, স্বৈরশাসকদের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা আজ এক আতঙ্কস্বরূপ। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে দেখিয়েছেন সামরিকতন্ত্র কখনও জনগণের মঙ্গল বয়ে আনে না। ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখতে স্বৈরশাসকরা ধনীকে আরও ধনী, গরিবকে আরও গরিব করেই শুধু রাখে না, ভোট ও ভাতের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখে। সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জনগণকে অসহায় করে তোলে। মূল্যবোধের অধগতির কারণে সমাজে অবক্ষয় দেখা দেয়, ধস নামে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজনৈতিক দূরদর্শীতায় সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশকে স্বৈরতন্ত্র্ মুক্তির মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অগ্রযাত্রায় এক দুঃসাহসী ভূমিকা পালন করেছেন। নানারকম আক্রমণ, হত্যার হুমকি, এমনকি গুলিবর্ষণ করেও স্বৈরশাসকরা তাঁর কণ্ঠকে রুদ্ধ করতে পারেনি। ২৩ জুন ১৯৯৬, প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে শেখ হাসিনা দ্রুত উন্নয়নের জোয়ারে দেশ ও জাতির জীবনে এক স্বস্তি এনে দিয়েছেন। নেতিবাচক রাজনীতির বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে আজ সম্ভাবনাময় পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে মর্যাদাপূর্ণ আসন গ্রহণে সমর্থ হয়েছে। বাঙালি তার সাহস ও আদর্শের কারণে আজ বীরের জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। এখানেই আমাদের অর্জন। এই অর্জনকে ধরে রাখার দায়িত্ব সকলের।

'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে শেখ হাসিনা' গ্রন্থটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিভিন্ন দেশ সফরকালে ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রদত্ত ভাষণের সংকলন। এ গ্রন্থের কয়েকটি ভাষণের ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার সৌজন্যে প্রাপ্ত। আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে অনুপম প্রকাশনীর মিলন নাথ আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এ গ্রন্থ্ থেকে পাঠক, গবেষক সকলেই উপকৃত হবেন এ প্রত্যাশা রাখি।

৫.২.২০০১ **বেবী মওদুদ**

পান্থপথ, ঢাকা

সূচী

ক্লিনটনের সফর দুদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক

বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের পক্ষে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহামান্য প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও তাঁর প্রতিনিধিদলের বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দকে আন্তরিক ও বিশেষ অভ্যর্থনা জানাই।

বাংলাদেশে কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টের এটাই প্রথম সফর এবং এতে দুদেশের মধ্যে উষ্ণ ও বন্ধুপ্রতিম বন্ধনসহ আমাদের সম্পর্কের সম্প্রতি যে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এতে তার প্রতিফলন ঘটেছে। আমি বাংলাদেশ থেকে দক্ষিণ এশিয়া সফর শুরু করার জন্য প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে বিশেষভবে ধন্যবাদ জানাতে চাই। তাঁর এ সিদ্ধান্তে আমরা গর্বিত।

১৯৯৭ সালে হোয়াইট হাউজে সংক্ষিপ্ত সফরকালে প্রেসিডেন্ট ও ফাস্ট লেডি আমাকে যে আন্তরিক আতিথেয়তা জানান আমি তা গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

আমি গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করতে চাই, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সাম্যের গভীর ও চিরন্তন মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের জন্য এ দেশ অর্জন করেছিলেন। তিনিই বাংলাদেশ-মার্কিন সম্পর্কের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ কারণে আমরা এই সম্পর্ককে মূল্য দিয়ে থাকি। এটা পরিতৃপ্তির বিষয় যে এই সম্পর্কের আজ যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য সম্মানজনক। তিনি এ সময়ের অসাধারণ নেতা ও রাষ্ট্রনায়ক।

আমরা দ্বিপক্ষীয় সর্ম্পক ও পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিস্ট বিষয়ে আলোচনা করেছি এবং আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি আমাদের আলোচনা ফলপ্রসূ ও গঠনমূলক হয়েছে।

আমরা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনায় উল্লেখ করেছি যে, গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকার ও মুক্তবাজার নীতি প্রশ্নে মার্কিন অঙ্গীকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার অভিন্ন মত পোষণ করে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশও সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী এবং উত্তেজনা প্রশমনে সক্রিয় প্রচেষ্টা চালাবার পক্ষপাতি।

বসনিয়া, কসোভ ও অন্যান্য অঞ্চলে শান্তি অর্জনে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনসহ মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের প্রচেষ্টার আমরা প্রশংসা করি।

আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের বিষয়ও আলোচনা করেছি। দেশটি আজ আমাদের বৃহত্তম রপ্তানি বাজার এবং ১৯৯৮-৯৯ সালে আমরা সেখানে ২শ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করেছি। এ প্রসঙ্গে আমরা প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে সরকারের উদার

অর্থনৈতিক নীতি এবং কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করেছি এবং যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশসহ তৈরী পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কোটা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করেছি। জ্বালানি খাতে সহযোগিতার প্রশ্নে আমরা উভয় দেশই এ খাতে বিপুল সম্ভাবনার কথা স্বীকার এবং আমাদের সহযোগিতা জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র একটি কৌশলগত বাস্তব চুক্তিও স্বাক্ষর করেছে। এর অধীনে যুক্তরাষ্ট্র (ক) অব্যবহৃত জ্বালানি উন্নয়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বর্ধিত প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা (খ) পরিবেশ উন্নয়ন এবং (গ) জ্বালানি খাত সংস্কারে বর্ধিত সরকারি সমর্থন অর্জনে ৩ কোটি ডলার অনুদান দেবে।

এ ছাড়া ঋণ লাঘব এবং ১৯৯৮ সালের গ্রীষ্মকালীন বন সংরক্ষণ আইনের অধীনে স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সুদ ব্যবহার সংক্রান্ত দুদেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ায় আমরা প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানাই। এটা শুভ সূচনা এবং পিএল-৪৮০'র অধীনে আমাদের ঋণ মওকুফ করার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণে আমরা প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানাই। আরো বেশ কয়েকটি চুক্তিও চূড়ান্ত হয়েছে। এর অধীনে বাংলদেশে বিভিন্ন প্রকল্পে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য সংস্থা অর্থের যোগান দেবে।

গ্যাস রপ্তানির প্রশ্নে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে অভ্যন্তরীণ চাহিদা সম্পূর্ণরূপে পূরণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ব্যবহারের লক্ষ্যে ৫০ বছরের গ্যাস মজুদ রাখার পর যা উদ্বৃত্ত থাকবে তা রপ্তানি করা যাবে।

অনুরূপভাবে বিদ্যুৎ রপ্তানির বেলায়ও আমরা মনে করি নতুন নতুন যেসব গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে সেগুলোর উপযুক্ত ব্যবহার আমরা অবশ্যই নিশ্চিত করব। সেজন্য আমরা বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক প্রাকৃতিক গ্যাস নির্ভর বিদ্যুৎ রপ্তানির প্রস্তাবকে স্বাগত জানাব।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় তথ্য প্রযুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে বলে আমরা প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে জানিয়েছি।

বাংলাদেশের প্রোগ্রামার, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার এবং তথ্য প্রযুক্তি পেশাদাররা বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সময়ের ব্যবধানের সুযোগ গ্রহণ করে তথ্য প্রযুক্তি পণ্য—সেবা সরবরাহ করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রও বাংলাদেশকে তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহয়তা দিতে পারে। এর ফলে দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংসস্থানের সুযোগ হবে।

আমরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের দেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়টি ত্বরান্বিত করতে প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করেছি। আমরা মনে করি এসব খুনীদের সাথে সন্ত্রাসী যোগাযোগ রয়েছে এবং আইনের শাসন সমুন্নত বিশ্বের বৃহত্তম এই গণতান্ত্রিক দেশে তাদের আশ্রয় হতে পারে না। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সহানুভূতিপূর্ণ সাড়ায় আমি অভিভূত। বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিগতভাবে তিনি যে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছেন সেজন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি নিশ্চিত, প্রেসিডেন্টের সফর আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি মাইফলক হয়ে

থাকবে এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের মাঝে বাংলাদেশের বহু অর্জিত সাফল্য তুলে ধরবে ও মর্যাদা বৃদ্ধি করবে।

প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন তার দেশ সফরের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং আমি তা সানন্দে গ্রহণ করেছি। এ বছর অক্টোবর মাসের কোনো একদিন এ সফরের দিন নির্ধারণ করা হবে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মি. বিল ক্লিনটনের বাংলাদেশ আগমনকে আমি স্বাগত জানাই। তাঁর এ সফর বাংলাদেশ ও আমেরিকার বন্ধুত্ব আরোও সুদৃঢ় করবে। তাঁর এ সফরে বাংলাদেশের মানুষ খুব আনন্দিত। আমি বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে মি. ক্লিনটনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলা ভাষণ : ২০ মার্চ ২০০০

হার্ভার্ড প্রতিটি প্রজন্মের প্রত্যেক ছাত্রের স্বপ্নের শিক্ষাঙ্গন

আপনাদের বিনয়ী কথাবার্তায় আমি অভিভূত। এ ধরনের গুণীজন সমাবেশে উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। হার্ভার্ড প্রতিটি প্রজন্মের প্রত্যেক ছাত্রের স্বপ্নের শিক্ষাঙ্গন এবং তারা ভাগ্যবান যারা একে অসাধারণ গুরুসদনের প্রবেশদ্বারে পরিণত করেছেন। আজকের সমাবেশে উপস্থিত হয়ে যারা একে মহিমান্বিত করে তুলেছেন সেইসব বিশিষ্ট অতিথিকে আমি আমার বিশেষ শুভেচ্ছা জানাই।

আপনারা অবগত আছেন যে, আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হয়েছেন। এমনকি সেদিনের নিষ্ঠুরতা থেকে আমার ১০ বছরের শিশু ভাইও রেহাই পায় নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাস হচ্ছে একের পর এক সামরিক অভ্যুত্থান পালটা অভ্যুত্থান এবং হত্যা ও ষড়যন্ত্রের ইতিহাস। গণতন্ত্র এবং জনগণের ভোটাধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়। জাতির এ ধরনের সংকটময় মুহূর্তে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় আমি নিরলস আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকি।

আমাকে আন্দোলনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয় এবং তা অবশ্যই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। অবশেষে আমি সফল হই। ১৯৯৬ সালের জুনে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে আমার দল জনগণের রায় নিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর মহিলাসহ দুস্থ ও অবহেলিত লোকজনের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়।

মহিলাদের উন্নয়নে আমার সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকারের নারী উন্নয়ন নীতির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের সমান অধিকার নিশ্চিত করা দেশের অবহেলিত নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন, তাদের নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা, তাদেরকে শিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা, তাদের দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

সরকার দেশের সকল পর্যায়ে মহিলাদের ক্ষমতায়নকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। এ লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসনের সর্বনিম্ন পর্যায়ে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে তিনটি সংরক্ষিত আসনে মহিলারা নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশের পৌরসভাগুলোতে মহিলাদের জন্যে আসন সংরক্ষণের বিধান রাখা হয়েছে।

চলতি পাঁচশালা পরিকল্পনায় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, উপার্জন এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে নারী ও পুরুষের অসমতা হ্রাসের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সুশাসন ও প্রশাসনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ভিত্তিতে দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে আমি বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। দারিদ্র্য বিমোচনকে আমি অগ্রাধিকার দিয়েছি। এ লক্ষ্যে বয়স্কদের জন্য পেনশন স্কীম, গৃহহীনদের জন্য গৃহনির্মাণ তহবিল এবং বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মতো কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। আমরা গৃহহীনদের আবাসন ও জীবিকার জন্য 'আশ্রয়ণ' নামে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছি। দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হলেও আমাদের এখনো অনেক কিছু করার আছে। এবার আমি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাদের লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সহযোগিতা কামনা করছি।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

কাউন্সিল অব উইমেন ওয়ার্ল্ড লিডার্স-এর নৈশভোজে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ ৫ এপ্রিল ২০০০, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে

আজ এখানে আপনাদের মাঝে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত এবং আপনাদের সদয় আতিথেয়তার জন্য কৃতজ্ঞ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর সব সময় আমার কাছে খুবই আনন্দের। বিভিন্ন সময় মার্কিন নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন স্তরের জনগণের সঙ্গে আলোচনায় আমার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার দারুণভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। আমেরিকা এখন সারা বিশ্বে খুবই শক্তিশালী দেশ। সর্বজনীন মুক্তি, স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রতি অঙ্গীকার এবং সারা বিশ্বে মানবাধিকার, আইনের শাসন ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অগ্রণী ভূমিকার জন্য দেশটি মর্যাদার উঁচু আসনে অধিষ্ঠিত।

বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এর সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। দুই দেশ বিগত বছরগুলোতে অর্জিত গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ অভিন্ন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাও অনুরূপ। আমাদের জনগণ স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানব-মর্যাদা, মানবাধিকার, মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ও সরকারের অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বিশ্বব্যাপী উত্তেজনা প্রশমন এবং শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি উন্নয়নে মার্কিন প্রচেষ্টায় আমরা মুগ্ধ। শান্তি ও নিরাপত্তা এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রশ্ন ও বিষয়ে আমরা মার্কিন অবস্থানকে অব্যাহতভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছি।

আমরা সারাবিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বলিষ্ঠ, গতিশীল ও বাস্তবমুখী নেতৃত্বের এবং গত কবছরে নজিরবিহীন অর্থনৈতিক বিকাশ ও সৃমদ্ধিরও প্রশংসা করে থাকি। ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যার সময় আমাদের জনগণের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা ও সমর্থনকে আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। আমরা বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের গভীর উৎকণ্ঠার জন্যেও কৃতজ্ঞ।

বাংলাদেশে আজ বিভিন্ন মার্কিন কোম্পানি তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানে জড়িত এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করছে। অতীতে এটা দেখা যায় নি। বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগের পরিমাণ সাড়ে তিন বছর আগের ১০০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে আজ ৩৮২৫ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। আগামী দিনগুলোতে তা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।

আপনারা জানেন, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন সম্প্রতি বাংলাদেশে গিয়েছিলেন। তাঁর এ সফর আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে টিকে থাকবে এবং দুদেশের সম্পর্কে গুণগত পরিবর্তনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আমি আশা করি এরপর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক আগামী দিনগুলোতে আরো শক্তিশালী ও সুসংহত হবে।

শেখ হাসিনা, লিঞ্চবার্গ, যুক্তরাষ্ট্র ৭ এপ্রিল, ২০০০

আমার আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির পথে পরিচালনা

আজ আমাকে এখানে যে সম্মান দেওয়া হয়েছে তার জন্য বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের পক্ষে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আমার অনুভূতি ও কৃতজ্ঞতা শুধুমাত্র ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আজকের এই নৈশভোজ বাংলাদেশ এবং আমাদের জনগণের জীবনের মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা সম্পর্কে কিছু বলার সুযোগ এনে দিয়েছে।

আজ থেকে ৩০ বছর আগে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তি অর্জনের পর স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী সদস্যের হাতে আমার পিতা পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ নিহত হওয়ায় তিনি তাঁর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে যেতে পারেন নি। আমার মা, তিন ভাই ও দুই ভাইয়ের নবপরিণীতা স্ত্রীসহ বাড়ির প্রায় সকল বাসিন্দাকে সেদিন হত্যা করা হয়। এমনকি আমার ১০ বছরের শিশু ভাইও তাদের নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা পায় নি।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবসময় বিশ্বাস করতেন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তিনি জানতেন বাংলাদেশের রয়েছে মূল্যবান মানব সম্পদ—যারা মেধাবী ও কঠোর পরিশ্রমী এবং সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী। তিনি বিশ্বাস করতেন নিরক্ষতা হচ্ছে বাংলাদেশের সকল সমস্যার মূল এবং যে কোনো দেশের কাছে মানব সম্পদ উন্নয়ন খাতই বিনিয়োগের সর্বোত্তম খাত। পরবর্তীতে আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জাতীয় উন্নয়ন ও সৃমদ্ধির জন্য তিনি সাক্ষরতার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ক্ষমতায় থাকাকালে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকারি অনুদানের আওতায় আনা হয়। আমার সরকারও শিক্ষা খাতের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। আমরা 'সবার জন্য শিক্ষা' নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। এই কর্মসূচিতে রয়েছে সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ২০০৫ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ। অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের স্কুলে পাঠাবার ক্ষতিপূরণের লক্ষ্যে 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' নামে একটি কর্মসূচিও আমরা চালু করেছি।

বিস্ময়করভাবে শিক্ষার হার সাড়ে তিন বছর আগের শতকরা ৪৭ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে শতকরা ৬০ ভাগে পৌঁছেছে। সরকার প্রকৌশল, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

আমার সরকার সাধারণ জনগণের জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিত এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সরকার দারিদ্র্য

বিমোচন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং সবার জন্যে শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। আমার সরকার খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ২০০২ সাল নাগাদ ২ কোটি ৫০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সরকার বাজেটের শতকরা ৪০ ভাগ সমাজ উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ করেছে।

আমরা গৃহহীনদের আশ্রয় ও জীবিকারএকটি 'আশ্রয়ণ' জন্যে নামে প্রকল্পও হাতে নিয়েছি। বয়স্কদের জন্যে পেনশন কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছে। আমার সরকার দুস্থ, বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের জন্যে ভাতা স্কিম চালু করেছে। আমি আনন্দের সঙ্গে বলতে চাই, দেশের তৃণমূল পর্যায়ে (ইউনিয়ন পরিষদ) ১৪ হাজার মহিলা নির্বাচিত হয়েছেন। অনুরূপভাবে দুস্থ মহিলাদের ক্রয় ক্ষমতা এবং পথশিশুদের অবস্থা উন্নয়নর মতো বিভিন্ন কর্মসূচিতে সম্পদ বরাদ্দ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সব সময় বিশ্বে শান্তি ও উন্নয়নের পক্ষে লড়াই করে যাচ্ছে। আমাদের অঞ্চলে সমঝোতা এবং বৃহত্তর অর্থনৈতিক সহযোগিতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে দক্ষিণ এশিয়া সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) গঠনে আমরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করি। আমরা ভারতের সঙ্গে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদন করেছি। আমরা তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা ছাড়াই দীর্ঘ জাতিগত বিরোধ অবসানে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেছি। পরবর্তীতে এ জন্য আমাকে ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৯৯৮ সালে ভারত ও পাকিস্তানের পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর এ অঞ্চলে উত্তেজনা প্রশমন এবং সংযম প্রদর্শনের পরামর্শ নিয়ে আমি নতুন দিল্লি ও ইসলামাবাদ সফরে যাই।

আমার মূল লক্ষ্য বাংলাদেশের অবয়বের পরিবর্তন। জনগণ—যারা আমাকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় পাঠিয়েছে তাদের কাছে আমার অঙ্গীকারের ব্যাপারে আমি খুবই সচেতন। আমার আশা ও আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির পথে পরিচালনা করা।

র‍্যান্ডলফ ম্যাকন উইমেন্স কলেজে পার্ল এস বাক পুরস্কার গ্রহণকালে সভাপতি আয়োজিত নৈশভোজে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তৃতা : লিঞ্চবার্গ, এপ্রিল ২০০০

আমাদের দেশটি আকারে ছোট হলেও প্রচুর সম্ভাবনাময়

আজ আপনারা আমাকে যে বিরল সম্মান দেখিয়েছেন তাতে আমি অভিভূত হয়েছি। আমি মনে করি, এ সম্মান শুধু আমাকেই নয় আমার দেশ ও দেশের জনগণকে প্রদর্শন করা হয়েছে। এজন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ বিপুল জনগোষ্ঠীর একটি ছোট্ট দেশ হলেও এর ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এর ১ লাখ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় সর্বমোট ১২ কোটি ৮০ লাখ লোকের বাস। আমরা বাংলাদেশে পুরোপুরি ও নিঃশর্ত শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি সাংবিধানিক বিধির আওতাভুক্ত। আমরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে শান্তি ও উন্নয়নকে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছি।

১৯৯৬ সালের ২৩ জুন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করি। আমরা প্রতিবেশী ভারতের সাথে পানি বণ্টনের বিষয়ের সমাধানে উদ্যোগ নিই। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে আমরা সফলভাবে দীর্ঘদিনের এই সমস্যার সমাধান করি। দক্ষিণ এশিয়ায় পারমাণবিক পরীক্ষা চালানোর পর আমি ভারত ও পাকিস্তান সফর করি। আমি তাদেরকে এই মর্মে আহ্বান জানাই যে, এ অঞ্চলে শান্তি রক্ষার জন্য আমাদের সবাইকে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সীমিত সম্পদকে কাজে লাগাতে হবে।

আমাদের দেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশের পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘ দুই দশক ধরে জাতিগত সমস্যা বিরাজ করছিল। দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা এই সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানের আহ্বান জানাই এবং তৃতীয় পক্ষের কোনো প্রকার মধ্যস্থতা ছাড়াই ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে সরকার ও বিদ্রোহী উপজাতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এই চুক্তির ফলে দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে গোলযোগপূর্ণ এলাকায় শান্তি ফিরে আসে। বিদ্রোহীরা অস্ত্র সমর্পণ করে এবং শান্তিপূর্ণ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যায়। এই চুক্তির পর আমি ১৯৯৮ সালে ইউনেস্কো ফেলিক্স শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হই।

বাংলাদেশে আজ চিরদিনের জন্য গণতন্ত্র দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে এবং একে স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে আমরা প্রতিটি সাধারণ নির্বাচনের তিন মাস আগে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে জনগণের পছন্দ মতো লোককে ভোট দেওয়ার অধিকার নিশ্চিত করেছি।

ইতোমধ্যে আমরা সংসদকে সার্বভৌম করার পদক্ষেপ নিয়েছি। জনগণের প্রতিনিধির কাছে বেসামরিক প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা সংসদীয় কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছি। এখন থেকে মন্ত্রীদের পরিবর্তে সংসদ সদস্যরাই হবেন সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রধান। এ ছাড়া জনগণের কাছে প্রধানমন্ত্রীর জবাবদিহির জন্য সংসদে প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব চালু করা হয়েছে।

আমরা রাজনৈতিক সংস্কারের ব্যাপারেও অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছি। কারণ আমরা মনে করি, আমাদের জনগণ তাদের অর্থনৈতিক অধিকার থেকে দীর্ঘদিন বঞ্চিত থাকতে পারে না। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে তাদের বেরিয়ে আসতে অবশ্যই আমাদের সহযোগিতা করতে হবে। তাই আমরা জরুরি ভিত্তিতে দারিদ্র্য বিমোচনের ওপর জোর দিয়েছি। এ ব্যাপারে সহযোগিতার লক্ষ্যে আমরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, কৃষি ও দ্রুত শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়েছি।

আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আমরা নীতিমালা গ্রহণ করেছি। দারিদ্র্য বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বার্ষিক বাজেটে আমরা সামাজিক খাতসমূহে ৪০ ভাগের বেশি বরাদ্দ দিয়েছি। এ ব্যাপারে আমাদের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে দরিদ্র ও ভূমিহীনদের জন্য আশ্রয় ও তাদের সস্তায় জীবিকার লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্প, বাড়ি ফেরা, ক্ষুদ্র ঋণ, বয়স্ক ভাতা, দুস্থ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তদের জন্য ভাতা, দুস্থ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থাসহ অন্যান্য প্রকল্প। নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা নিশ্চিত করার জন্য আরা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রহণ করেছি। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমরা আইন করেছি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছি। আমরা সকল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের সামিল করেছি। স্থানীয় সরকার প্রশাসনের সর্বনিম্ন পর্যায় ইউনিয়ন পরিষদের গত নির্বাচনে প্রায় ১৪ হাজার মহিলা নির্বাচিত হয়েছেন।

আমি দৃঢ়তার সাথে ও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই যে আমরা বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত করতে চাই। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন আমরা তা বাস্তবায়ন করতে চাই। আমাদের দেশটি আকারে ছোট হলেও প্রচুর সম্ভাবনাময়। আমরা আশা করছি যে, আমাদের সীমিত সম্পদ ও কঠোর পরিশ্রমী জনশক্তি দিয়ে এই সহস্রাব্দীতে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তুলতে পারব।

আমাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আবারো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পরম আনন্দ ও গর্বের সাথে আপনাদের প্রদত্ত সম্মান আমি গ্রহণ করেছি।

লিঙ্কবার্গ শহরের চাবি উপহার অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ : ৭ এপ্রিল ২০০০

জাপান এশিয়ার মূল চালিকা শক্তি

আজকের এ মনোরম সন্ধ্যায় জাপানের মান্যবর প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিরো মোরি-কে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। শিল্পোন্নত-৮ জাতিগোষ্ঠীর সভাপতি হিসেবে আপনার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই আমরা আপনাকে এবং আপনার প্রতিনিধি দলকে বাংলাদেশে অভ্যর্থনা জানাতে পেরে খুশি হয়েছি।

আপনি অবগত আছেন যে, আধুনিক জাপান ও স্বাধীন বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৭২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে জাপান সফর করেছিলেন। সেই ঐতিহাসিক সফরের মাধ্যমেই আমাদের দু'দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এ ঘটনাবহুল সফরের সময়ে বঙ্গবন্ধু জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, সাধারণভাবে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে মিল রয়েছে। বঙ্গবন্ধু যে বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা হলো—আমরা উভয়েই এশিয়া মহাদেশের জাতি এবং এশিয়ায় ও বিশ্বে শান্তি, প্রগতি ও স্থিতিশীলতার ব্যাপারে আমরা অভিন্ন মতামত পোষণ করে থাকি। একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিধি-ব্যবস্থার ব্যাপারে আমরা জাপানের সঙ্গে একমত। জাপানের মতো বাংলাদেশের জনগণেরও রয়েছে একই ধরনের সংস্কৃতি, জনগোষ্ঠী ও ভাষা। জনগণের মধ্যে এ ধরনের একাত্মতা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য একান্ত অপরিহার্য। আমরা আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে গভীরভাবে মূল্যায়ন করি এবং তা লালন ও সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট রয়েছি।

আমি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হবার এক বছরের মধ্যেই যেসব দেশ সফর করেছি তার মধ্যে জাপান অন্যতম। ঠিক একইভাবে আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন হবার স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই জাপান সফর করেছিলেন। জাপানকে যথার্থই এশিয়ার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ জাপানের অর্থনীতি এশিয়ার অবশিষ্ট অংশের দ্বিগুণ এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম। যোগাযোগ ও কম্পিউটার প্রযুক্তির সম্মিলনে যে অন্তহীন ও বিস্ময়কর সম্ভাবনার সৃষ্টি হতে পারে তা প্রথম যে কয়টি দেশ অনুধাবন করতে পেরেছিল তার মধ্যে জাপান অন্যতম।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এ প্রসঙ্গে আমি জাপানের জনগণকে তাদের উদ্ভাবনীশক্তি, শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠাবোধের জন্য গভীর শ্রদ্ধা জানাই। তাদের এ কর্মতৎপরতার জন্যই জাপান আজ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এতটা সাফল্য অর্জন করেছে।

আজ থেকে ২৫ বছর আগে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে ইতিহাসের বর্বর ও নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে আমরা আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হারিয়েছি। আমাদের জন্য আগস্ট সত্যিই এক গভীর শোক ও দুঃখের মাস। আপনি অবগত আছেন যে, এ সুগভীর জাতীয় ট্রাজেডি আমার জন্য এক সীমাহীন ব্যক্তিগত মর্মবেদনা।

সেদিনের সে মর্মান্তিক ঘটনার মাধ্যমে জাতি হারিয়েছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতী সন্তানকে, যিনি সমগ্র বাঙালি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে তাদেরকে মুক্তি ও জাতীয়তাবাদের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেদিনের সে বর্বরোচিত ঘটনায় ব্যক্তিগতভাবে আমি হারিয়েছি আমার প্রাণপ্রিয় বাবা ও মাকে। হারিয়েছি আমার দু'ভাই ও তাদের নবপরিণীতা দু'বধু এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে। আমার মাত্র ১০ বছর বয়সের ছোট ভাই রেহাই পায়নি ঘাতকের হাত থেকে। আমি এবং আমার একমাত্র ছোট বোন তখন বিদেশে থাকায় ঘাতকের হাত থেকে সেদিন বেঁচে গিয়েছিলাম।

জাতির জনক ছিলেন আমাদের নেতাদের মধ্যে মহত্তম। দেশ ও জনগণের জন্য তাঁর ছিল মহৎ স্বপ্ন ও দূরদৃষ্টি। জাতির জনকের শাহাদতবরণের পর বিভিন্ন রকমের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও শঠতার মধ্যেও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। তাঁর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার পবিত্র দায়িত্ব আজ আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে। ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে আমরা যে গণতান্ত্রিক অধিকার হারিয়েছিলাম তা পুনরুদ্ধার করতে আমাদের বেশ কয়েক বছর ধরে নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়েছে। আজ আমরা জাতির জনকের সুখী ও সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে বদ্ধপরিকর।

১৯৯৬ সালে আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে জাতিকে গণতন্ত্রের পথে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এবং জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের বাস্তবমুখী কর্মসূচি গ্রহণের ফলে মাথাপিছু গড় আয় ৩৮৬ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। সাক্ষরতার হার ১৯৯৬ সালে ছিল ৪৭ শতাংশ, আজ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২ শতাংশে। দারিদ্র্যসীমার পর্যায় ৪৭ শতাংশ থেকে ৪৪ শতাংশে নেমে এসেছে। আমরা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, দারিদ্র্য বিমোচন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নসহ বিভিন্ন সামাজিক খাতের উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদান করেছি। আমাদের গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আশ্রয়ণের মাধ্যমে গৃহহীনদের বাসস্থান ও জীবিকার সংস্থান করা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, গরিবের জন্য শিক্ষা, ক্ষুদ্র ঋণ, বয়স্কভাতা, দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা এবং সুনির্দিষ্ট দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম।

স্থিতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং তার সমতাভিত্তিক বন্টন আমাদের লক্ষ্য। আমাদের জনগণের উদ্যোগী মনোভাবকে স্বীকৃতি দিয়ে আমরা প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে বেসরকারি খাতকে উৎসাহ দিচ্ছি। আমরা বিদেশী শিল্পোদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ উৎসাহজনক সুযোগ-সুবিধা ঘোষণা করেছি। আমরা আনন্দিত যে জাপানের বিনিয়োগকারীগণ বাংলাদেশকে তাঁদের বিনিয়োগের অন্যতম স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছেন। আমি তাঁদেরকে বাংলাদেশে যৌথভাবে বা এককভাবে আরো বিনিয়োগের আহ্বান জানাই। বাংলাদেশে তাঁদের বিনিয়োগ সুফলদায়ক ও লাভজনক হবে বলে আমি মনে করি।

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা সফল মতবিনিময় ও অর্থবহ আলোচনা করেছি। আমরা আনন্দিত যে, জাপান বিশ্বে শান্তি ও স্থিতিশীলতা স্থাপনে বদ্ধপরিকর। আমরা আপনাদের এধরনের মনোভাবের একান্ত অংশীদার। আজ আমরা আনন্দিত যে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো জাপানও বিশ্বাস করে যে বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ মানুষ যতদিন ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অনুন্নয়নের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রামে লিপ্ত থাকবে ততদিন শান্তির ভিত্ রচনা করা সম্ভব হবে না। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব আজ একক বিশ্বে পরিণত হয়েছে এবং যেকোন স্থানের দারিদ্র্য পৃথিবীর যেকোন স্থানের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, জাপান বিশ্বের সমৃদ্ধি অর্জনে তার গঠনমূলক ভূমিকা অব্যাহত রাখবে। এ ব্যাপারে আমাদের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করছি। আমি আশা করি, আপনার দায়িত্বকালে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উত্তরোত্তর আরো বৃদ্ধি পাবে।

আমি নিশ্চিতভাবে আশাবাদী যে, আপনার এ সফর বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে বিরাজমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উত্তরোত্তর আরো জোরদারকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এখন আমি প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিরো মোরি'র সুস্বাস্থ্য, সুখ, শান্তি ও দীর্ঘজীবন এবং বাংলাদেশ ও জাপানের চিরস্থায়ী বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কামনায় আমার সঙ্গে টোস্টে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

১৯ আগস্ট ২০০০ ঢাকায় জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিরো মোরি'র সম্বর্ধনায় প্রদত্ত ভাষণ।

জাতিসঙ্ঘকে মানুষের কল্যাণে অবদান রাখতে হবে

স্বল্প সময়ে মানব সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশ্বে এক অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নতুন সহস্রাব্দের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মানব সমাজের নবতর আশা আকাঙ্ক্ষা আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাবে।

আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শোষণ ও বঞ্চনামুক্ত একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। ১৯৭৪ সালের এ মাসেই তিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর সে ভাষণে তিনি শান্তি, উন্নয়ন, ন্যায়বিচার ও সাম্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর ভাষণে উল্লিখিত সেসব চ্যালেঞ্জ আজো আমরা মোকাবিলা করে যাচ্ছি।

জাতির জনকের সে ভাষণের প্রায় এক বছর পর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একদল ঘাতকের হাতে তিনি সপরিবারে শাহাদাত বরণ করেন। আমরা দুবোন তখন দেশের বাইরে থাকাতে বেঁচে যাই। হত্যাকারী ও ষড়যন্ত্রকারীরা মৌলিক মানবাধিকার হরণ করে এবং ধ্বংস করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। তবে দেশের জনগণের দৃঢ় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তাদের সে অশুভ চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেয়। দেশের প্রচলিত আইনে হত্যাকারীদের বিচার হয়েছে—তারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। অবশ্য তাদের কয়েকজন বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সাজাপ্রাপ্ত হত্যাকারীদের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আমাদের দেশে ফেরত পাঠানো হবে।

আমি মহাসচিব কফি আনানকে তাঁর মিলেনিয়াম রিপোর্ট “We the Poeples”-এর জন্য ধন্যবাদ জানাই। দারিদ্র্য বিমোচন, সংঘাত প্রতিহতকরণ, পরিবেশ পুনরুজ্জীবন এবং জাতিসংঘ নবায়ন সম্পর্কে তাঁর প্রস্তাবসমূহ বিশ্বের নেতৃবৃন্দকে নতুন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সৃষ্টির জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। একবিংশ শতাব্দীর ঊষালগ্নে পৃথিবীতে একটি ন্যায়ানুগ, সুন্দর, সমতাভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকলের একযোগে কাজ করা প্রয়োজন। উন্নয়ন ও এর সুফল সবার নিকট সমানভাবে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন গণতন্ত্র। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা যাতে উপকৃত হতে পারি সেজন্য আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

শান্তি উন্নয়নের পূর্বশর্ত। বাংলাদেশ মনে করে শান্তি একটি মৌলিক মানবাধিকার। এ অধিকার আমাদেরকে অর্জন করতে হবে এবং তা সবসময়ের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে।

পৃথিবীর যে কোনো স্থানে শান্তির প্রতি হুমকি দেখা দিলে তা পৃথিবীর সর্বত্রই বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। তাই আমরা বিশ্বব্যাপী শান্তির সংস্কৃতি উন্নয়নে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাই।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সমতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন বৈষম্য দূর করা এবং সমাজের দুর্বল জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করা। এ লক্ষ্যে আমরা নারী, শিশু ও অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছি।

দেশের জনগণের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে আমরা বেশ কিছু উদ্ভাবনী কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি এক যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করেছে। একইসাথে আমরা প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, জনসংখ্যা কার্যক্রম ও নারীর ক্ষমতায়নে সুনির্দিষ্ট সাফল্য অর্জন করেছি।

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, শান্তি মিশনের ব্যাপারে জাতিসংঘ নতুন চিন্তা-ভাবনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। গত কয়েক বছর যাবৎ এ শান্তি মিশনে অংশগ্রহণকারী দেশ এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ শান্তি মিশনকে আরো কার্যকর ও অর্থবহ করার জন্য জোরালো ভূমিকা পালন করবে।

জনগণের নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিধান করাই হচ্ছে জাতিসংঘের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও রোগ-শোক থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য টেকসই ও সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন। যদিও ক্ষুদ্র ঋণ এবং অন্যান্য দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে আমরা সফলতা অর্জন করেছি, তবুও দারিদ্র্য দূর করার জন্য আমাদের আরো অনেক কিছু করতে হবে।

বাংলাদেশ ও আমাদের অঞ্চলে ডেঙ্গু নামক একটি ম্যালেরিয়া জাতীয় জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। এ ছাড়া অনেকেই আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে। এইডস-এর মতো ঘাতক ব্যাধিও আশঙ্কজনকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। এসব রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে। তাই এ ধরনের রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন সমন্বিত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রচেষ্টা।

জাতিসংঘকে আমাদের এমনভাবে শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে যাতে এ বিশ্ব সংস্থা সকল মানুষের কল্যাণে অবদান রাখতে পারে। আমরা আশা করি যে, এ সহস্রাব্দ শীর্ষ সম্মেলন জাতিসংঘের জন্য এমন এক গতির সঞ্চার করবে যার ফলে এ সংস্থা দারিদ্র্য বিমোচন, জনগণের ক্ষমতায়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, পরিবেশ সংরক্ষণ, পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠা এবং শান্তির সংস্কৃতির বিকাশে আমাদেরকে অধিকতর সহায়তা প্রদান করতে পারবে।

জাতিসংঘ মিলিনিয়াম সামিটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রদত্ত বাংলা ভাষণ : ৬ সেপ্টেম্বর ২০০০

অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীদের স্বীকৃতি দেয়া উচিত নয়

সর্বপ্রথমে আমি পশ্চিম তিমুরে নিহত মানবিক-সহায়তা কর্মীদের শোকার্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক শোক ও সমবেদনা জানাই।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের এ শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে ২৬ বছর আগের একটি বিশেষ দিনের কথা আজ বার বার মনে পড়ছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের অব্যবহিত পরে সেই বিশেষ দিনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ পরিষদে ভাষণ দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর সে ভাষণে জাতিসংঘ সনদের মূলনীতির প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন ও আস্থার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন। তখন থেকে আমরা সে অঙ্গীকার সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করে যাচ্ছি। জাতিসংঘের জন্য ভবিষ্যতেও আমরা সক্রিয় ভূমিকার মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করে যাব। আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিষদের সদস্য হিসেবে বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছে। আমাদের এ অবদান শান্তি, নিরাপত্তা ও জাতিসমূহের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন।

আজ এমন এক সময়ে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি যখন বিশ্ব পরিবর্তনশীল বাস্তবতা এবং ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বিশ্বায়নের এ যুগে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার কাজে নিয়োজিত একমাত্র সংস্থা হিসেবে নিরাপত্তা পরিষদ বেসামরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় এ বিশ্বে আরো অধিকতর অবদান রাখতে পারে।

আনন্দের বিষয় যে, নিরাপত্তা পরিষদ এখন বেসামরিক জনগণের মানবিক সংকটগুলোর সমাধানের প্রতি বিশেষভাবে নজর দিচ্ছে। প্রথমবারের মতো শান্তি মিশনে শিশু রক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এসব কিছু শুভ সূচনা।

জাতিসংঘের শান্তি মিশন কার্যক্রমের উন্নয়নের ওপর প্রতিবেদনকে আমি বাংলাদেশের পক্ষে থেকে স্বাগত জানাই। মহাসচিব কফি আনানকে সেজন্য ধন্যবাদ। এ প্রতিবেদনের সুপারিশমালা পর্যালোচনার জন্য আমাদের গভীর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মূল কারণসমূহ খুঁজে বের করে তা দূর করার উপায় নির্ধারণের জন্য সর্বময় ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে নিরাপত্তা পরিষদকে অবশ্যই সফল হতে হবে। এ

প্রেক্ষিতে এ শীর্ষ সম্মেলন থেকে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচন, টেকসই উন্নয়ন, গণতন্ত্র, সুশাসন পদ্ধতি, আইনের শাসন ও মানবাধিকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করা প্রয়োজন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে আমরা মানবতার ওপর যুদ্ধ ও সংঘাতের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছি। এ সময়ে দুলাখ মা-বোন সম্ভ্রম হারিয়েছেন এবং তিরিশ লক্ষ মানুষ গণহত্যার শিকার হয়েছেন। আমাদের মুক্তিকামী জনগণ মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁরই নেতৃত্বে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছ। কিন্তু দুঃখের বিষয় তখনকার পরাজিত শক্তি পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনককে সপরিবারের হত্যা করেছে। সে ষড়যন্ত্র এখনো শেষ হয় নি। আমাকেও বেশ কয়েকবার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়কে অবশ্যই মানবতার নিরাপত্তার নিরিখে বিচার কতে হবে। সাধারণ জনগণের ওপর যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং নির্বিচারে গণহত্যার ক্ষতিকর প্রভাব দূর করার জন্য আমাদের বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে। শান্তির সংস্কৃতির বিকাশের মাধ্যমে সশস্ত্র সংঘাত প্রতিরোধে নিরাপত্তা পরিষদকে আরো গুরুত্ব দিতে হবে।

যুদ্ধে নারীদের ক্ষতিগ্রস্ততা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না । সংঘাত নিরসনে নারীদের ন্যায্য ভূমিকা রাখার সুযোগ দিতে হবে। বুরুন্ডি, কঙ্গো এবং সোমালিয়ার মহিলারা শান্তি প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র অর্জন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশসমূহের পুনর্গঠনের কাজে বিরাট সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। একইভাবে সশস্ত্র সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে আমি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে শিশু সৈন্য মুক্ত এলাকা স্থাপন সম্পর্কিত বাংলাদেশের প্রস্তাবের প্রতি নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা উন্নয়নে সামগ্রিক ও পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রতি সক্রিয় সমর্থন আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার।

গতকালই বাংলাদেশ অমানবিক অস্ত্রবিরোধ চুক্তিতে (CCWC) অংশ নিয়েছে এবং স্থল মাইন চুক্তিতে অনুসমর্থন দিয়েছে।

সাংবিধানিকভাবে নির্বাচিত কোনো সরকারকে অবৈধভাবে উৎখাত করে যারা ক্ষমতা দখল করে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমি মনে করি জাতিসংঘ এ ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। শান্তি, গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য।

আমি তাই প্রস্তাব করি যে, পৃথিবীর জনগণের এই সর্বোচ্চ সংস্থায় এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে—"government of the people, by the people, for the people"

পৃথিবীতে সর্বজনীনভাবে বজায় থাকবে; শাসনতান্ত্রিক বিধান লঙ্ঘন করে সামরিক শক্তির মাধ্যমে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকে কখনোই স্বীকৃতি দেওয়া হবে না।

বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনার মাধ্যমে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিরাজমান গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করেছে। এর ফলে আমাদের অঞ্চলের দেশসমূহের জনগণের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতার পথ সুগম হয়েছে। আমাদের জাতীয় প্রেক্ষাপটে আমরা দেখেছি যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে শান্তি অর্জন করা সম্ভব। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় দুদশক যাবৎ বেসামরিক সংঘাত বিরাজিত ছিল। আমরা রাজনৈতিক আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সে সমস্যার সমাধান করেছি।

আমাদের সামনে রয়েছে অসংখ্য চ্যালেঞ্জ। তাই আমি মনে করি অতীতের তুলনায় ভবিষ্যতে নিরাপত্তা পরিষদের আরো অনেক বেশি শীর্ষ সম্মেলনে বসা প্রয়োজন। যুগান্তকারী ইতিহাস সৃষ্টির জন্য বিশ্ব আজ তাদের নেতৃবৃন্দের প্রতি তাকিয়ে রয়েছে।

বর্তমান প্রজন্ম মানব সভ্যতাকে নিয়ে নতুন সহস্রাব্দের পথ পাড়ি দিচ্ছে। একটি যুদ্ধবিহীন পৃথিবী প্রতিষ্ঠায় শান্তির সংস্কৃতি রুপায়ণের ঐতিহাসিক দায়িত্ব আমাদেরই অঙ্গীকার নিয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রদত্ত বাংলা ভাষণ : ৭ সেপ্টেম্বর ২০০০

মহিলাদের জন্যে নিরাপদ বিশ্ব গড়তে ৫ দফা

মহিলাদের অগ্রগতি ও ক্ষতায়নের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখার জন্য আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে পেরে আমি সত্যিই সম্মানিত বোধ করছি। সময়ের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ এবং জাতিসংঘের জন্য একটি নতুন দিক-নির্দেশনা প্রণয়নের জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এখন এই নগরীতে সমবেত হয়েছেন। বর্তমান বিশ্বে মহিলারা যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তার ওপর আলোকপাত করার এটা এক চমৎকার সুযোগ। সময়োচিত এ অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য স্ট্যার্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড ফোরামকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ আয়োজনের অবদান রাখার জন্য ইউনিসেফও প্রশংসার দাবি রাখে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দ্রুতগতিতে বিশ্বায়ন ঘটছে। বেশ কয়েকটি পথে মহিলারা বিশ্বায়নের অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। মহিলারা ন্যায় বিচার ও অর্থনৈতিক সমতাসহ তাদের ক্ষমতায়নের দাবি পূরণের পথে বার বার প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। শুরুতে সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতির জন্য সবাই বিশ্বায়নকে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু সে প্রত্যাশা বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এখনো বাস্তবায়িত হয় নি। এর পরিবর্তে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া লাখ লাখ মানুষের জীবনে দুর্ভোগ বয়ে এনেছে। বিশ্বায়নের ফলে অনেক ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষের চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কেবল অর্থনৈতিক সংকটই এ দুরবস্থার জন্য দায়ী। এর সামাজিক প্রভাব সুদূরপ্রসারী। দারিদ্র্য আজ মহিলাদের প্রান্তসীমায় পৌঁছে দিয়েছে এবং তাদেরকে আরো ক্ষমতাহীন ও দুস্থ নারীতে পরিণত করেছে। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মহিলাদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। পরিবার ও সমাজে তাদের ভূমিকা ক্রমান্বয়ে লোপ পাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে তারা পাচারকারী ও অন্যান্য সুযোগ সন্ধানীদের সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছে। এক্ষেত্রে শিশু-কিশোরীদের অবস্থা আরো করুণ।

মহিলারা দীর্ঘদিন থেকে শোষণ, কুসংস্কার এবং অপব্যবহারের শিকার। সারা বিশ্বে তারা বৈষম্যের সম্মুখীন। দারিদ্রতা আর সহিংসতা তাদের সুযোগ-সুবিধার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এখন আমরা একটি নতুন সহস্রাব্দে প্রবেশ করেছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি মহিলারা এখন আর পেছনের আসনে বসে থাকতে প্রস্তুত নয়। এটি সত্যিই উৎসাহজনক। সমাজের সমান অংশীদার হিসেবে মহিলারা এখন শুধু তাদের সম্ভাবনা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে সচেতনই নয়, তারা নিজেরাই নিজেদের পথ তৈরি করে নিচ্ছে। চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সন্ত্রস্ত হলেও বর্তমান বিশ্বে মহিলারা অনেক বেশি

ঐক্যবদ্ধ। একজন মহিলা এবং তৃতীয় বিশ্বের একজন নারী নেত্রী হিসেবে আমি আমাদের সাফল্যে আনন্দিত।

আমরা এ ব্যাপারে সচেতন যে সবকিছুই সবসময় উৎসাহজনক নয়। আমরা অগ্রগতি অর্জন করেছি। কিন্তু বেদনাদায়ক হলেও তা মন্থর এবং কোনো কোনো সময় অপর্যাপ্ত। এমনকি শতাব্দীর শেষ প্রান্তেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মহিলার ভোটাধিকার ছিল না। তারা এখন ভোটাধিকার পেয়েছে। কিন্তু জনজীবনে তাদের অংশগ্রহণ এখনো সীমিত। এ ছাড়া রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং সকল মানবাধিকারের সমন্বয় ঘটে নি। তবে আমরা মহিলাদের বিষয় নিয়ে যখন কিছু করি তা হলে সে ব্যাপারে বেশি সংকল্পবদ্ধ থাকি এবং দৃঢ়পদক্ষেপ গ্রহণ করি।

বিশ্বায়নের প্রতিকূল পরিণতি সম্পর্কে হতাশা ছড়ানোর জন্য আমরা এখানে সমবেত হই নি। আমরা এখানে এসেছি একটি গঠনমূলক সমাধান খুঁজে বের করার জন্য। আমি বিশ্বাস করি একাজ করার জন্য আমাদের একটি আদর্শ ফোরাম রয়েছে। মহিলাদের বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নারী নেতৃবৃন্দের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। তাই আমি বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জকে সুযোগ ও সম্ভাবনায় রূপান্তরিত করতে জীবনের সর্বস্তরের নারী নেতৃত্বকে সম্মিলিত ও দৃঢ় প্রচেষ্টা চালানোর আহবান জানাচ্ছি।

আমাদের দেশকে সৃমদ্ধ করার জন্য আমরা যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি সে ব্যাপারে আমি আপনাদের অবহিত করতে চাই। নারীর ক্ষমতায়ন ও অগ্রগতির প্রতি আমরা পুরোপুরি অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ ব্যাপারে আমাদের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি মহিলারা আমাদের জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় সফল ও সক্রিয় অংশীদার। আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল স্রোতধারায় মহিলাদের উন্নয়নের জন্য আমাদেরকে একটি পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। আমরা সে পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছি। মহিলাদের উন্নয়নকে আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে নারীর ক্ষতায়নের জন্য আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। মহিলাদের উন্নয়নের জন্য আমরা একটি জাতীয় নীতিমালা ঘোষণা করেছি। আমাদের সামাজিক আন্দোলনের ফলে লাখ লাখ গ্রামীণ মহিলা ঋণ, সঞ্চয় প্রকল্প, প্রশিক্ষণ, সাক্ষরতা ও আইনগত অধিকারের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষুদ্র আকারের উপার্জনমুখী কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে পেরেছে।

আমাদের সরকার আশ্রয়ণ নামে একটি আশ্রয় ও জীবিকা প্রকল্প চালু করেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা যৌথভাবে স্বামী ও স্ত্রীকে বিনামূল্যে ঘর এবং ৮ শতাংশ জমি দিচ্ছি। আমরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৪টি সংস্থার মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণও দিচ্ছি। এ ঋণ আদায়ের হার ৯৭ শতাংশেরও বেশি। তৈরী পোশাকসহ আনুষ্ঠানিক উৎপাদন শিল্পগুলো মহিলাদের জন্য নিম্ন আয়ের কাজের পরিবর্তে নতুন সুযোগ-সুবিধার দুয়ার খুলে দিয়েছে। মহিলাদের জন্য আমরা পারিবারিক সঞ্চয়পত্র, দুস্থ মহিলাদের জন্য বিশেষ অনুদান এবং স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলাদের জন্য আর্থিক অনুদান চালু করেছি।

আমরা চার লাখ দুস্থ স্বামী পরিত্যক্তা নিয়োগে ১০ শতাংশ কোটা নির্ধারণ করে দিয়েছি। আমরা দুজন মহিলা সচিব ও একজন বিচারপতি নিয়োগ দিয়েছি। এছাড়া পুলিশ বিভাগে ৫ জন উচ্চ পদস্থ মহিলা কর্মকর্তা নিয়োগ লাভ করেছেন। এ ছাড়া পরিবার, সম্প্রদায় এবং দেশের কল্যাণে আমরা নারী শিক্ষার ব্যাপারে সামাজিক চিন্তাধারায় বিরাট পরিবর্তন এনেছি। স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং মা ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসে আমরা সম্ভাব্য সকল সহায়তা দিচ্ছি। আমরা মহিলাদের ধর্ষণ, পাচার এবং এসিড নিক্ষেপসহ সকল প্রকার সহিংসতা থেকে রক্ষা পুরোপুরি অঙ্গীকারবদ্ধ। তাদের অধিকার রক্ষায় আমরা আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

আমরা নীতি নির্ধারণে নারীকে জড়িত করার মাধ্যমে তাদেরকে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে স্থানীয় সংস্থাগুলোতে তাদের প্রতিনিধিত্ব অত্যাবশ্যকীয় করেছি। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি যে, ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ৪৬ হাজার মহিলা অংশ নেন। এর মধ্যে ১৪ হাজার মহিলা তৃণমূল পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য এবং ২৩ জন চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন। বর্তমানে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর প্রায় ২২ শতাংশ সদস্য হচ্ছেন মহিলা। তারা গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন কর্মকান্ডে এবং স্থানীয় আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমরা সংসদে মহিলাদের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষণে সংবিধানে ব্যবস্থা রেখেছি। আমরা শিশুর পরিচয়ের ক্ষেত্রে বাবার পাশাপাশি মায়ের নাম লেখার বিধানও চালু করেছি।

দারিদ্র্যতা এখনো আমাদের জন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে রয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণের মতো ব্যবস্থা মহিলাদের মধ্যে শুধু উদ্যোক্তাই সৃষ্ট করে নি, তাদের ক্ষমতায়নেও অবদান রেখেছে। আজ আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি এই ক্ষুদ্র ঋণ যুক্তরাষ্ট্রের দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়নেও চালু হয়েছে। হারলেম, ব্রুকলিন এবং শিকাগোর দরিদ্র মহিলারা ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে সহায়াতা পাচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বের ৬৫টি দেশে ক্ষুদ্র ঋণসহায়তার মাধ্যমে মহিলারা উপকৃত হচ্ছে। বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মহিলা এখনো দরিদ্র। বিশ্বায়নের প্রতি তারা বাধা হয়ে থাকবে। বর্তমান বিশ্বে মহিলাদের ভূমিকা সম্প্রসারণের জন্য দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপক মৌলিক পদক্ষেপ নিতে হবে।

মহিলাদের ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় তাদের যুক্ত করতে ৫টি খাত চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

১. আমাদেরকে দারিদ্র্য বিমোচনের কাজ শুরু করতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করা হলে মহিলাদের সংকট ও অস্থিতিশীলতার পাশাপাশি অসহায়ত্বও হ্রাস পাবে। এক্ষেত্রে আমাদের সফলতা নির্ভর করবে নারী সংগঠন, সিভিল সোসাইটি ও বেসরকারি খাতসহ সরকারের অংশগ্রহণের ওপর।

২. বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, বাজার এককভাবে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে পারে না। তাই আমাদের প্রয়োজন নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় মহিলাদের ভূমিকা বৃদ্ধি করা।

৩. মানবিক কর্মকাণ্ডের সকল খাতে মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমেই একমাত্র ক্ষমতায়ন সম্ভব। এ ধরনের অন্তর্ভুক্তি না হলে মহিলারা পেছনের সারিতেই থেকে যাবে।

৪. মহিলাদের মানবাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে মেয়ে শিশুদের বিষয়টিকে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। বিশ্বব্যাপী যোগযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতি নারী ও শিশু পাচারের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। এ পরিস্থিতি রোধে আন্তর্জাতিক সংহতি প্রয়োজন।

৫. শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করা জরুরি। শান্তির সংস্কৃতি বিকাশে মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিশ্ব রাষ্ট্রীয় ফোরাম ও ইউনিফেম আয়োজিত আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'নিরাপদ বিশ্বায়নে নারী' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন ৮ সেপ্টেম্বর ২০০০

উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশ গড়তে সকলের সহযোগিতা চাই

আপনার জানেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি আকারে সীমিত কিন্তু উন্মুক্ত এবং উন্নয়নশীল। আমাদের রয়েছে বিশাল জনসংখ্যা। প্রায়শই আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়। এজন্য অর্জিত অর্থনৈতিক অগ্রগতিও বিপর্যস্ত হয়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সরকারের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অতীতের অগণতান্ত্রিক সরকারগুলো ব্যক্তি ইচ্ছা ও খেয়ালখুশিকে প্রাধান্য দিয়েছে।

জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে সঠিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা গ্রহণ তথা জনসাধারণের অর্থনৈতিক চাহিদার সঠিক যোগান গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারে বলে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের যে তত্ত্ব রয়েছে তার সাথে আমরা একমত। আমরা বিশ্বাস করি যে, সুষম ও টেকসই উন্নয়ন কেবল গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের দ্বারা অর্জন করা সম্ভব। এ অঙ্গীকার থেকেই দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় আমরা দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়েছি। আপনারা জানেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘৃণ্য খুনিচক্র আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে দেশে সামরিক আইন জারি করে। এরপর সামরিক শাসকরা একের পর ক্ষমতা দখল করতে থাকে। তারা নির্বাচনে কারচুপি করে উর্দির ওপর গণতন্ত্রের লেবাস এঁটে অসাংবিধানিক ক্ষমতাকে বৈধ করার অপচেষ্টা চালায়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় জনগণের অংশীদারিত্ব পুরোপুরি অস্বীকৃত থেকে যায়। অস্ত্র, হত্যা, ক্যু, ষড়যন্ত্র ক্ষমতার পালাবদলের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং জনগণ দিনের পর দিন অবহেলিত, বঞ্চিত ও শোষিত হতে থাকে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি জনগণের অংশীদারিত্ব ছাড়া গণতন্ত্র অর্থবহ হতে পারে না এবং গণতন্ত্র ছাড়া জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তাই সামরিক শাসক ও স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন আন্দোলন করি। 'আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব' এই শ্লোগান দেশব্যাপী প্রচার করে জনগণকে ভোটের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলি। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি তুলি এবং আন্দোলনের মাধ্যমে এক্ষেত্রে সফলতা লাভ করি। আমি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি তুলি এবং আন্দোলনের মাধ্যমে এক্ষেত্রে সফলতা লাভ করি। আমি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিদেশী পর্যবেক্ষক আনার ব্যবস্থা করি। এ

আন্দোলন করতে গিয়ে বারবার আমাকে কারাবরণ করতে হয়েছে এবং মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সকল প্রতিবন্ধকতাকে অঙ্গীকার নিয়ে সাহসের সাথে মোকাবিরা করেছি। জনগণের ভোটের অধিকার আজ প্রতিষ্ঠা করেছি। অগণতান্ত্রিক শক্তি এখনো বিভিন্নভাবে দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে গণতন্ত্র নস্যাতের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। তবে এ ব্যাপারে জনগণ ও আমাদের সরকার সজাগ রয়েছে।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয় অবাধ ও সুষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এ নির্বাচনে জনগণের ভোটে নির্বাচত হয়ে দারিদ্র্যমুক্ত দেশ অর্থাৎ জনগণের ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমার সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার গঠন করেই গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার কাজ শুরু করি। সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রীর পরিবর্তে সংসদ সদস্যদের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন ও আইন সংস্কার কমিশন গঠনের মাধ্যমে প্রশাসনকে গণমুখী এবং পুরোনো আইনসমূহকে যুগোপযোগী করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি, শিল্পনীতি, বিদ্যুৎনীতিসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের সরকার ঘোষিত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির আওতায় তৃণমূল পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে সুসমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শিশুদের সার্বিক উন্নয়ন ও শিশু অধিকারের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জনশক্তিকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরে বিভিন্ন সুপরিকিল্পত কর্মসূচি আমরা বাস্তবায়ন করছি। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

গত চার বছরে অর্থাৎ ১৯৯৬-এর জুন থেকে এ পর্যন্ত অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাসহ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই সময়ে আমরা প্রত্যেক অর্থবছরে পাঁচ শাতংশের বেশি জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। ইতিপূর্বে শুধুমাত্র জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রবৃদ্ধি সাত শতাংশ উন্নীত হয়েছিল। আমাদের সরকারের সুপরিকিল্পত ও সঠিক জনকল্যাণমূলক অর্থনৈতিক কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তাবায়নের ফলেই পরপর চার বছর প্রবৃদ্ধি অর্জনের এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এরমধ্যে ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে শতাব্দীর ভয়াবহতম দীর্ঘস্থায়ী বন্যাও আমরা সফলভাবে মোকাবিলা করেছি। বন্যা-উত্তর পুনর্বাসন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন এবং সময়মত কৃষিঋণ, সারসহ অন্যান্য উপকরণ কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার ফলে পরপর চার বছর কৃষিতে বাম্পার ফলন হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। কৃষির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় কৃষিনীতি প্রণয়ন করেছে। এবারও এক অপ্রত্যাশিত ভয়াবহ বন্যায়

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। ১৯৯৮-এর ভয়াবহ বন্যা মোকাবিলার মতো আল্লাহর রহমতে আমরা এবারের বন্যাও একই প্রত্যয় ও দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম হব।

অতীতে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাসমূহ অতিক্রম করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানো, সম্পদের সুষম ও সর্বোত্তম ব্যবহার ও বণ্টন নিশ্চিতকরণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর ক্ষমতায়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং প্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা ও গতিশীলতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আমাদের সরকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাশাসনিক ক্ষেত্রে যুগোপযোগী সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

আমাদের সরকার ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুশৃঙ্খল নিয়ম-নীতির প্রতিষ্ঠা করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম আরো গতিশীল করে বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। লোকসানি রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করাসহ বেসরকারি খাতের উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

আমাদের সরকারের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচির মূল লক্ষ্য দারিদ্র্য বিমোচন। আমরা দারিদ্র্য বিমোচনে জনসাধারণকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে নতুন কৌশলের উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছি। দারিদ্র এবং বঞ্চিত জনগণের নিকট উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়া এবং তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন করাই সে উদ্ভাবিত কৌশলের চিহ্নিত বৈশিষ্ট্য। দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড গতিশীল ও জোরদার করার জন্য আমাদের সরকার মানব সম্পদকে উন্নয়নের উপাদান ও এর বিকাশকে উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগকে গুরত্ব দেওয়া হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত আমাদের সরকারের কর্মসূচিসমূহ ইতোমধ্যেই সুফল দিতে শুরু করেছে। বর্তমানে জনগণের গড় আয়ু বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬১ বছর। প্রতি হাজারে জন্মগ্রহণকারী শিশুর মৃত্যুহার ৭৭—এ হ্রাস পেয়েছে। দেশে সাক্ষরতার হার শতকরা ৬২—তে উন্নীত হয়েছে এবং মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮৬ মার্কিন ডলারে। দারিদ্র্যের হার পূর্বের ৪৭ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৪৪ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ণ, ঘরে ফেরা, গৃহায়ন, আদর্শগ্রাম প্রকল্প এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ভিজিডি, ভিজিএফ, বয়স্ক ভাতা, দুস্থ মহিলা ও বিধবা ভাতা, টেস্ট রিলিফ ও খয়রাতি সাহায্যসহ বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের অধীনেই প্রথম পর্যায় ২০০২ সাল পর্যন্ত ৫ বছর মেয়াদে ৫০হাজার দুস্থ ভূমিহীন পরিবারকে আশ্রয় দানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পে ২৪ হাজার ৭৫০টি দুস্থ পরিবার পুনর্বাসিত হয়েছে। গত বছরের মার্চ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মান্যবর বিল ক্লিনটন বাংলাদেশ সফর করেন।

সফরকালে তিনি আশ্রয়ণ প্রকেল্পর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি এসব কার্যক্রমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং এরূপ কাজে সহায়তা দেওয়ার জন্য গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। ছয়টি বিভাগীয় শহরে অসহায় ষাটোর্ধ্ব বয়স্ক মানুষের জন্য ৬টি শান্তি নিবাস স্থাপন করা হচ্ছে। সরকার বেকারদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

বাংলাদেশের দারিদ্রের ব্যাপকতার কারণে সরকারের বহুমুখী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি সত্ত্বেও এক বিরাট জনগোষ্ঠী এখনো দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছে। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (Social safe-net programme) কর্মসূচি দারিদ্র্যের তাৎক্ষণিক কষাঘাত থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে রক্ষায় বর্ম হিসেবে কাজ করছে। তবে স্থায়ী সমাধান হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে দারিদ্র বিমোচনই আমাদের সরকারের লক্ষ্য। কিন্তু যেহেতু দারিদ্র্য ব্যাপক সেজন্য সরকারি উন্নয়ন প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি খাত যাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে সে লক্ষ্যে আমাদের সরকার বেসরকারি খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন উৎসাহব্যঞ্জক সুযোগ-সুবিধা ও সহযোগিতা প্রদান করছে।

আমরা বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কর্মসূচিতে ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছি। সরকারি ১৪টি সংস্থার মাধ্যমে দরিদ্র জনগণ বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। এ ঋণ পরিশোধের হার শতকরা ৯৮ ভাগ। আমরা প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১ দশমিক ৫ শতাংশ কমিয়ে এনে আমরা বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছি। আমরা নারীর ক্ষমতায়নের প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছি। ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার পরিষদের সদস্য পদের সরাসরি নির্বাচনে প্রায় ৪৬ হাজার মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল এবং এর মধ্যে প্রায় ১৪ হাজার মহিলা নির্বাচিত হয়।

এ সত্ত্বেও বাংলাদেশ উন্নয়ন-অগ্রযাত্রার নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বৈদেশিক সাহায্য ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত হয়ে আসার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ দ্রুত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে না। অথচ বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য আমাদের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করতে হচ্ছে, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হচ্ছে এবং নির্মাণ উপাদান বৃদ্ধিকল্পে শিল্পখাতে বিনিয়োগ করতে হচ্ছে। আমরা আশা করি, ২০০১ সালে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশ সংক্রান্ত তৃতীয় কনফারেন্সে বাংলাদেশসহ অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের জন্য মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি অফিসিয়াল বৈদেশিক সাহায্য বৃদ্ধির ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। আমরা আশ্বস্ত যে, বর্তমানে বৈদেশিক সাহায্য সরবরাহে জনগণের অংশগ্রহণ সমৃদ্ধ গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। আমরা আমাদের দেশে গণতন্ত্রের চর্চাকে প্রতিষ্ঠানিকতায় স্থায়ী রূপ দিতে দৃঢ়সংকল্প। এ ব্যাপারে আমরা আপানাদের সকলের সহযোগিতা চাই।

আমি উল্লেখ করেছি যে, উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য অফিসিয়াল উন্নয়ন সাহায্য বা ওডিএ ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের রপ্তানি বাণিজ্য উন্নত বিশ্বের বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে শুল্ক ও শুল্ক-বহির্ভূত নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। পাশাপাশি উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের মধ্যে জনবল ও কারিগরী জ্ঞানের ব্যবধান হেতু উন্নয়নশীল দেশসমূহে অভ্যন্তরীণ বাজারে সেবাখাত অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন বলে সমস্যা আরো বেড়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশের রপ্তানি পণ্যের উন্নত বিশ্বের বাজারে শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকারের দাবি দীর্ঘদিনের। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ৩৩টি স্বল্পোন্নত দেশের তৈরী পোশাক ও বস্ত্রখাতকে শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা প্রদান করেছে। আমরা আশা করি, বাংলাদেশকেও এ সুযোগ দেওয়া হবে।

বাংলাদেশ অবশ্যই বিশ্বায়নে অংশগ্রহণ করতে চায়। কারণ আমরা না চাইলেও বিশ্বায়নের রেশ প্রতিনিয়ত আমাদের অর্থনীতিতে অনুভূত হচ্ছে। তবে আমরা মনে করি যে, বিশ্বায়ন ও সীমানাহীন দুনিয়া আমাদের সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সক্ষম নয়। বিশ্বায়ন যেখানে উন্নত দেশসমূহকে ক্রম বিকশিত হতে সাহায্য করছে সেখানে দরিদ্র ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশসমূহকে বিশ্বায়ন আরো পর্যুদস্ত করে দিতে পারে। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে নতুন বিশ্ব অর্থনীতি নতুন অসমতা ও অবিচারের জন্ম না দেয়।

আমরা জানি যে, বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে যে ঝুঁকি আছে তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অনেক উন্নয়নশীল দেশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। বিশ্বায়নে যে সুযোগ উন্মোচন করে তার সুবিধা ভোগ করতে হলে আমাদেরও সেসব ঝুঁকি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। আমি আশা করি, এখানে উপস্থিত সম্মানিত বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে কার্যকর সুপারিশ রাখবেন।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় দেশের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়ে। বাজার অর্থনীতির পূর্ণাঙ্গ ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার সে ব্যবস্থার অন্যতম। বাজার অর্থনীতির সঠিক পরিচালনায় সরকার আগ্রহী। দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদক ও ভোক্তা উভয়েই যেন প্রতিযোগিতামূলক দক্ষ বাজার ব্যবস্থার সম্মুখীন হয় সে ব্যাপারে আমরা উৎসাহী। কিন্তু সে প্রতিযোগিতায় গরিব লোককে যাতে সরে যেতে না হয় সে ব্যাপারেও আমরা সজাগ। গরিবের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ছাড়াও বাজার ব্যবস্থা উন্মুক্ত রাখতে হবে যাতে তারা সেখানে সহজেই অংশগ্রহণ করতে পারে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আপনারা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারেন বলে আমি মনে করি। সঙ্কুচিত বৈদেশিক সাহায্যের পটভূমিতে ইতোমধ্যে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশের

অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। বর্তমান বিশ্বে তথ্য-প্রযুক্তির যে বিপ্লব সঙ্ঘটিত হচ্ছে সে বিপ্লব সম্পর্কে আপনারা আলোকপাত করেছেন। এ প্রযুক্তি এ কারিগরী বিজ্ঞান ব্যবহার করে বাংলাদেশ উপকৃত হতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আপনারা এ ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগযোগ করে আপনাদের প্রস্তাব পেশ করতে পারেন। দেশকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে তুলতে আপনাদের সহযোগিতা চাই। দারিদ্র্যমুক্ত, শোষণমুক্ত, 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলে জাতির জনকের স্বপ্ন আমরা বাস্তবায়ন করবই ইনশাআল্লাহ।

এ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আজকের সভা আয়োজক Association for Economic and Development Studies on Bangladesh—AEDSB কেও জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

অর্থনীতি ও উন্নয়ন স্টাডিজ সমিতির (AEDSBI) আলোচনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ : ১৬ অক্টোবর, ২০০০

বাংলাদেশ আকর্ষণীয় নিরাপদ ও লাভজনক বিনিয়োগের আদর্শ স্থান

আজ সত্যিই আমার জন্য একটি আনন্দের দিন। বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমার চিন্তা-ভাবনা উপস্থাপনের লক্ষ্যে আমাকে আমন্ত্রণ ও উষ্ণ অভিনন্দন জানানোর জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

যোগযোগ প্রযুক্তির বিস্ফোরণের ফল হিসেবে যখন সর্বত্র ব্যাপক পরিবর্তন চলছে তখন আজ নতুন শতাব্দী ও নতুন সহস্রাব্দে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। তথ্য প্রযুক্তি ও বিশ্বায়ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এই পরিবর্তনের বিস্তার বিস্ময়কর। প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের বক্তব্য অনুযায়ী ইতিহাসের যে কোনো সময়ের চেয়ে বিশ্বে এখন বেশি পরিবর্তন চলছে। এই পরিবর্তনকে সারা বিশ্বের জনগণের কল্যাণে কাজে লাগানোর জন্য আমাদের দায়-দায়িত্ব এবং কাজও বেড়ে গেছে। একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ অর্জনেএবং বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি থেকে পুরোপুরি সুযোগ গ্রহণ করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশে সামরিক স্বৈরাচারদের উৎখাত করেছি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে এনেছি। প্রশাসনে আমরা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করেছি। নতুন শতাব্দীর অন্যতম প্রধান দাবি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আমরা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি গণতন্ত্র হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

বাংলাদেশের জনগণ গত দশকে যুক্তরাষ্ট্রের নজিরবিহীন অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করেছে এবং নতুন সহস্রাব্দের শুরুতে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে স্বাগত জানিয়েছে। ক্লিনটন এ বছরের ২০ মার্চ ঢাকা সফর করেন। এ সফরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে গুণগত পরিবর্তন এসেছে। আমাদের দ্বিপক্ষীয় আলোচনা এবং অভিন্ন ইস্যু ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট সহযোগিতা সম্প্রসারণেও এ সফর কাজে লেগেছে। এতে আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক খাতের নাটকীয় উত্তরণ উঠে এসেছে এবং সমাজের দুস্থ ও কম সুবিধা প্রাপ্তদের ব্যাপারে আমাদের উদ্বেগের কথা প্রতিফলিত হয়েছে। এ ছাড়া আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য আমার সরকার যে গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এই সফরের মাধ্যমে তারই প্রতিফলন

ঘটেছে। আশ্বস্ত করছি যে, অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে আমাদের সম্পর্ক এখন আরো বেশী শক্তিশালী। সবদিক থেকে আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ভবিষ্যৎ আরো বেশী উজ্জ্বল।

ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের সঙ্গে আমার এই বৈঠককে আমি প্রসিডেন্ট ক্লিনটনের সফরের পর নতুন সম্পর্কে স্থায়ী ও জোরদার করার প্রচেষ্টারই অংশ বলে মনে করি। বাংলাদেশে মার্কিন ব্যবসায়ী বিনিয়োগকারী তাদের অংশীদারদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধিও এ বৈঠকের অন্যতম লক্ষ্য।

১৯৯৮ সালের প্রলয়ংকরী বন্যা সত্ত্বেও গত চার বছরে বাংলাদেশে গড়ে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ইতঃপূর্বে আর কখনো বাংলাদেশে পরপর এ ধরনের প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় নি। একমাত্র জতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। আমাদের সময় দূরদর্শী সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ফলে মুদ্রাস্ফীতি, আর্থিক এবং চলতি হিসাব ঘাটতি কম হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাতীয় সঞ্চয় এবং বিনিয়োগও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় সঞ্চয় ১৯৯০ সালের ১১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালে ১৪ শতাংশ দাঁড়িয়েছে। একই সময় বিনিয়োগ ১১ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮ দশমিক ৫ শতাংশে পৌঁছে গেছে।

বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিও সমভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের রপ্তানির ৩৭ শতাংশের কাছাকাছি ছিল। যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে ২শ কোটি ডলারের বস্ত্র ও কাপড় রপ্তানি করেছে। ৩১টি ক্যাটাগরির তৈরী পোশাকের ওপর আরোপিত কোটা পদ্ধতির কারণে যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। কোটা বহির্ভূত ৪৫টি আইটেমও যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে আমাদরে রপ্তানিকৃত পোশাক অগ্রাধিকারভিত্তিক মূল্যায়ন পাচ্ছে না। অথচ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে আমরা এ ধরনের অগ্রাধিকার মূল্যায়ন প্রত্যাশা করতে পারি। অগ্রাধিকারভিত্তিক মূল্যায়ন না হওয়ায় আমাদের রপ্তানি যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ হারের শুল্কের সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে আমরা দ্বৈত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছি। এসব প্রতিবন্ধকতা যদি অপসারিত হয় তা হলে আমাদের পণ্য মার্কিন বাজারে আরো বেশি করে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারবে। এর ফলে বাংলাদেশ টিনজাত খাদ্য, হোসিয়ারি, সিল্ক পণ্য, চা, মসলা, স্বর্ণালংকার, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের মতো অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতায় নামতে পারবে। বাংলাদেশ মার্কিন বাজারে তার পণ্যের কোটা ও শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার চায়।

সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগকেও আমার সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। এর মাধ্যমে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হয়েছে। যেসব খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হচ্ছে সেগুলো হল– তেল, গ্যাস এবং অন্যান্য খনিজ উৎপাদন ও উত্তোলন, বিদ্যু উৎপাদন ও বিতরণ, তথ্য প্রযুক্তি, কৃষিভিত্তিক ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প,

সেতুসহ মহাসড়ক উন্নয়ন, বন্দর অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিবহন সুযোগ-সুবিধা, পানি শোধন ও বিতরণ, স্যানিটেশন এবং ঘন বর্জ্য পদার্থ নষ্টকরণ, শিল্পোন্নয়ন অঞ্চল এবং যোগাযোগ।

আপনারা শুনে আনন্দিত হবেন যে, বেসরকারি বিনিয়োগ বিকাশের জন্য বাংলাদেশ প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। বিনিয়োগ বোর্ডের ভূমিকা ও দক্ষতা বাড়ানো হয়েছে। নতুন বিনিয়োগকে সহায়তা করার জন্য বোর্ড এখন প্রস্তুত রয়েছে। একমাত্র রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগের ব্যাপক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনকি অধিকতর উদার শর্তে সরকার বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠারও অনুমতি দিচ্ছে।

বিদ্যুৎ খাতে সংস্কারের কর্মসূচির অংশ হিসেবে সরকার প্রতিযোগিতা চালু ও বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন নীতি অনুমোদন করেছে। টেলিযোগাযোগ খাতে সমন্বয় আনার পর মোবাইল ফোন, গ্রামীণ টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এবং সফটওয়্যার শিল্পে বেসরকারি বিনিয়োগের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

দুদেশের মধ্যকার সময়ের ব্যবধানের ফলে যুক্তরাষ্ট্রকে সেবা প্রদানে বাংলাদেশ তথ্য প্রযুক্তি চমৎকার অবস্থানে রয়েছে। ডব্লিউটিও-এর আইটি চুক্তিতে যোগ না দিলেও বাংলাদেশ এর শর্তাবলি বাস্তবায়ন করেছে। বাংলাদেশ এখন শুধু আইটি সরঞ্জাম শুল্ক মুক্তভাবে আমদানির অনুমতিই দিচেছ না, অতিসম্প্রতি আমরা বেসরকারি খাতে ভি-স্যাট সরঞ্জাম সংগ্রহ ও পরিচালনার নীতিমালা গ্রহণ করেছি।

আন্তর্জাতিক আইটি অবকাঠামোর সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ জোরদার করার লক্ষ্যে আমরা বঙ্গোপসাগরের মধ্যদিয়ে সাবমেরিন ফাইবার অপটিক সংযোগেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বছরে ১০ হাজার আইটি বিশেষজ্ঞ তৈরির জন্য আমরা একটি বিরাট কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। এখন আমাদের যা প্রয়োজন তা হচ্ছে– আমাদের আইটি পণ্যের জন্য বাজারের আশ্বাস এবং যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের আইটি বিশেষজ্ঞদের প্রবেশ সহজীকরণ।

আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং গ্যাস অনুসন্ধান ও উন্নয়নের ফলে গত চার বছরে বাংলাদেশে মার্কিন কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ডলারের কাছাকাছি। গত বছর এই বিনেয়াগ ৮০কোটি ডলারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আগামী বছর মার্কিন বিনিয়োগ শত কোটি ডলারে পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সফরের সময় মার্কিন কোম্পানিগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের ৪৩ কোটি ৫০ লাখ ডলারের দুটি বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যমন্ত্রী উইলিয়াম ডেলি তখন চুক্তি স্বাক্ষর প্রত্যক্ষ করেন।

মার্কিন কোম্পানি ওয়ার্ল্ড টেল হোল্ডিংস ঢাকায় ৩ হাজার লাইনের একটি টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি ও পরিচালনা করতে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের একটি উন্মুক্ত দরপত্রে অংশ নেওয়ার পর ওয়ার্ল্ড টেলকে

টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। সমুদ্রের তলদেশে ফাইবার অপটিক সিস্টেম নির্মাণ ও স্থাপনের লক্ষ্যে টাইকো সাবমেরিন সিস্টেমস লিমিটেড বাংলাদেশ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এই সিস্টেম বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরকে সংযুক্ত করবে এবং এর দৈর্ঘ্য হবে আনুমানিক ৩ হাজার ২শ কিলোমিটার। ২০০২ সালের মধ্যে এর নির্মাণ ও স্থাপন কাজ সমাপ্ত হওয়ার কথা রয়েছে। এই পদ্ধতি চালুর পর সারা বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশর সংযোগ সৃষ্টি হবে। এর ফলে বাংলাদেশ এখনকার স্যাটেলাইট নির্ভরতা থেকে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোয় উত্তরণে সুযোগ পাবে। এগুলো হচ্ছে আমাদের দুদেশের মধ্যে সহযোগিতার কয়েকটি খাত।

তবে আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি যে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি বহুমুখী সম্পর্কের ব্যাপারে আমরা সংকল্পবদ্ধ। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের মধ্যে সহযোগিতা আরো বৃদ্ধিতে আজকের এ সভা ভিত্তিস্থাপন করবে বলে আমি আশা করি। এ সভা টেলিযোগাযোগ, কৃষি, ব্যবসা ও তথ্য প্রযুক্তি খাতে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে মার্কিন কোম্পানিগুলোর জন্য প্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধির পথও সুগম করবে।

পরিশেষে আমি বাংলাদেশের দেওয়া বিনিয়োগ সুযোগ-সুবিধা সদ্ব্যবহার করার জন্য আপনাদের সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের বৈচিত্র্যময় দেশ ও এর সুযোগ-সুবিধা স্বচক্ষে দেখার জন্য আমি আপনাদের বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি নিশ্চিত আপনারা বাংলাদেশকে একটি আকর্ষণীয় এবং নিরাপদ ও লাভজনক বিনিয়োগের আদর্শ স্থান হিসেবে দেখতে পাবেন।

মার্কিন ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণ : ১৮ অক্টোবর ২০০০

মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

আমরা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইসরাইলিদের নৃশংসতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। ফিলিস্তিনিদের ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রশ্নে মুসলিম উম্মাহকে অবশ্যই একটি ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। আমরা শান্তির লক্ষ্যে আরব ভাইদের সকল প্রচেষ্টায় সব ধরনের সমর্থন দিয়ে যাব।

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের একটি ন্যায্য সমাধান ও শান্তি প্রতিষ্ঠাই আমাদের প্রধান উদ্বেগের বিষয়। একটি দীর্ঘ ও বেদনাদায়ক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের ফিলিস্তিনি ভাইয়েরা এ অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনার আশা নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। কিন্তু ইসরাইলিদের ঔদ্ধত্যের কারণে কখনো শান্তি আসে নি।

এখন ইসরাইলিরা ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে নতুন করে সহিংসতা শুরু করেছে। আমাদের ফিলিস্তিনি ভাইয়েরা যখন পরিকল্পিত উস্কানিমূলক তৎপরতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়েছে ঠিক তখনই ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালিয়ে তাদের হত্যা করেছে। এমনকি প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতের আবাসিক ভবনটিকেও বাদ দেওয়া হয় নি। ইতোমধ্যে শতাধিক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ, সাধারণ পরিষদ এবং মানবাধিকার কমিশন নিরস্ত্র বেসামরকি লোকদের ওপর অত্যধিক শক্তি প্রয়োগ ও উস্কানি দেওয়ার জন্য ইসরাইলকেই দায়ী করেছে। বাংলাদেশ ফিলিস্তিনি ও অধিকৃত ভূখণ্ডে ইসরাইলি নৃশংসতার ব্যাপারে তীব্র নিন্দা জানাতে ইসলামি উম্মাহর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আমরা ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য অধিকারের জন্য তাদের সংগ্রামের প্রতি অব্যাহত সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করছি, এসব অধিকারের মধ্যে রয়েছে জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে বসবাসের লক্ষ্যে তাদের পূর্ব পুরুষদের বাসভূমিতে ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন।

আমরা নতুন বসতি গড়ে তোলাসহ এ ধরনের যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা এবং অবিলম্বে নৃশংসতা বন্ধের জন্য ইসরাইলের ওপর ক্রমবর্ধমান ও কার্যকর চাপ প্রয়োগের জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। কারণ নতুন বসতিগুলো স্থাপনের লক্ষ্য হচ্ছে অধিকৃত আরব ভূখণ্ডের ধর্মীয়, জাতিগত ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য পালটে দেওয়া।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ফিলিস্তিনি আরবদের বৈধ অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো যথাযথভাবে মোকাবেলা করে সমগ্র আরব-ইসরাইল সংঘাতের একটি ন্যায্য ও সুষ্ঠু সমাধানই কেবল অব্যাহত সহিংসতার অবসান ঘটাতে পারে। এ ধরনের সমাধান অবশ্যই সংশ্লিষ্ট জাতিসংঘ প্রস্তাব এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে ইতোমধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলোর ভিত্তিতে হতে হবে।

এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের সময় বা পরে অধিকৃত সকল আরব ভূখণ্ড থেকে ইসরাইলি দখলদারিত্ব প্রত্যাহার সংক্রান্ত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব ২৪২. ৩৩৮, ও ৪২৫ এবং শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব ২৩৭ অবশ্যই অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা এসব সম্মত অবস্থান থেকে কোনো ধরনের বিচ্যুতি সমর্থন করি না। কারণ, সেগুলো মধ্যপ্রাচ্য বিরোধের একটি স্থায়ী, সম্মানজনক ও ন্যায্য সমাধান নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হবে।

বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির জন্য সকল উদ্যোগকে স্বাগত ও সমর্থন করে। যুক্তরাষ্ট্র এবং অনেকগুলো দেশ ইতোমধ্যে এই লক্ষ্য অর্জনে বেশ কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে। এ সত্ত্বেও, শান্তির জন্য ইসরাইলের প্রকৃত সদিচ্ছার অভাবের কারণে তারা ইতিবাচক ফলাফল লাভ করতে পারে নি। ইসরাইল কেবল তাদের স্বাক্ষরিত চুক্তিই লংঘন করছে না বরং তারা ফিলিস্তিনদের ওপর নৃশংস হামলা ও নতুন করে সন্ত্রাস চালিয়ে পরিস্থিতিকে আরো খারাপ করছে।

আমরা ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময় ফিলিস্তিনিদের ওপর একটি অত্যন্ত অন্যায় ও অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে বসতবাড়ি থেকে সরে যেতে বাধ্য করা হয়েছিলো। ইসরাইল এর পর থেকে আগ্রাসনের মাধ্যমে আরব ভূখণ্ডে অবৈধভাবে দখল সম্প্রসারণ করেছে এবং তাদের বসতি স্থাপন কর্মসূচী এখনো অব্যাহত রয়েছে।

এজন্য শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে ইসরাইলকে বরং সামরিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তাসহ সব ধরনের সহায়তা দেওয়া এবং প্রকৃতপক্ষে উৎসাহিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সম্প্রতি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদে প্রস্তাব প্রণয়ন ও অনুমোদনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে। আমরা ফিলিস্তিনি পরিস্থিতির ওপর মানবাধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ কমিশনের বিশেষ অধিবেশন আহ্বানেও অংশ নিয়েছি। আমাদের প্রতিনিধি বেসামরিক ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রেক্ষিতে ফিলিস্তিন বিষয়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিশেষ অধিবেশনে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি জোরালোভাবে তুলে ধরেছে।

আমরা মনে করি, ফিলিস্তিন প্রশ্নে ও তার ন্যায়সঙ্গত লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণের লক্ষ্যে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। আমি এখানে পুনর্ব্যক্ত করতে চাই যে , আমরা এই মহতী ফোরামে আমাদের উম্মাহর মধ্যেকার ঐক্য প্রদর্শন করেছি। আমরা ফিলিস্তিনে ও আরব বিশ্বে আমাদের ভাইদের

পাশে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছি, মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে এই বিষয়টি সারা বিশ্বকে দেখানোর এখনই হচ্ছে সঠিক সময়।

এখনই সারা বিশ্বকে জানাতে হবে যে ফিলিস্তিনি, আরব ও সারাবিশ্বের মুসলমানদের কাছে আল কুদস আল-শরীফ ও হারাম আল-শরীফ অত্যন্ত প্রিয় এবং তারা কখনোই এগুলোর ওপর থেকে তাদের দাবি প্রত্যাহার করবে না।

আজকে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা হবে সংশ্লিষ্ট জাতিসংঘ প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য দৃঢ় সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ শক্তি গড়ে তোলা। মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার একটি সম্মানজনক সমাধানে পৌঁছার লক্ষ্যে ফিলিস্তিনি ও আরব ভাইদের প্রচেষ্টার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য ওআইসির অন্যান্য সদস্য দেশ ও মুসলিম উম্মাহর বাকি অংশের সঙ্গে কাজ করতে বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি।

১৩. নভেম্বর. ২০০০ কাতারে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সা. সা. সংস্থায় প্রদত্ত ভাষণ

মুসলিম নারীর ভূমিকা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কর্মপরিকল্পনা

জীবনের সকল স্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো দেশের বাস্তব ও প্রকৃত উন্নয়ন হয় না। ইসলামের প্রাথমিক যুগে দৈনন্দিন জীবনে মহিলারা পুরুষের সমান ভূমিকা পালন করতেন। তারা ধর্মযুদ্ধে এবং ইসলাম ও ইসলামি সংস্কৃতির প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপনেও অংশগ্রহণ করেন। ইসলামের নীতি ও শিক্ষানুযায়ী মহিলাদের সমান মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকার অর্জন হলেই কেবল মহিলার সুস্থ পারিবারিক জীবন ও মানব উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

জেরুজালেমকে রাজধানী করে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতি বাংলাদেশের অব্যাহত ও সর্বাত্মক সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করছি। মধ্যপ্রাচ্যে অবশেষে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, এমন একটি প্রত্যাশা যখন জেগে উঠেছিল ঠিক তখনই ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে নতুন করে সহিংসতা চালানো হয়। সাম্প্রতিককালে যে সংঘর্ষের বিস্তার ঘটেছে, তা ইসরাইলি উগ্র ডানপন্থী নেতাদের ইচ্ছাকৃত উস্কানিরই প্রতিফলন। নিরস্ত্র বহু প্রতিবাদকারী এখন তাজা বুলেটে প্রাণ দিচ্ছে। এমনকি প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতের বাসভন কমপ্লেক্সেও বোমাবর্ষণ করা হয়েছে। সহিংসতায় উস্কানি প্রদান ও নিরস্ত্র বেসামরিক লোকজনের ওপর অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগের জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ, সাধারণ পরিষদ এবং মানবাধিকার কমিশন ইসরাইলকেই দায়ী করেছে। আমরা নিরপরাধ ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলিদের এই বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। ফিলিস্তিনি আরবদের ন্যায্য অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হলে, পূর্ব জেরুজালেমসহ অধিকৃত আরব ভূখণ্ড প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে না দিলে এবং সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটিতে ফিরে আসতে না দিলে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে না। শান্তির লক্ষ্য অর্জন করতে হলে কোনো রকম বিলম্ব না করে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব বিশেষ করে ২৪২. ৩৩৮ ও ৪২৫ নম্বর প্রস্তাব অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে।

ফিলিস্তিনের ব্যাপারে আমার অবস্থানে কেবলমাত্র নীতিগতই নয়, আমার ব্যক্তিগত যন্ত্রণাভোগ ও অভিজ্ঞতাও এতে নিহিত রয়েছে। আমি যুদ্ধ ও সহিংসতা ঘৃণা করি। এসবের মূল শিকার নিরপরাধ নারী ও শিশুরাই বেশি হয়। ১৯৭১ সালে যখন আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলছিল, তখন আমি প্রথম সন্তান সম্ভবা ছিলাম। বন্দি অবস্থায় একটি স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে আমার ছেলের জন্ম হয়। এই যুদ্ধে ৩০ লাখের বেশি মানুষ নিহত এবং দুই

লাখ মহিলা ধর্ষিতা হয়। পরে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে একদল কুচক্রী আমার পিতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে। এমনকি আমার ১০ বছর বয়সী শিশু ভাইকেও খুনীরা রেহাই দেয় নি। এর পর বাংলাদেশের ইতিহাস অমানবিক বর্বরতা এবং সামরিক ও আধা-সামরিক শাসনের দিকে মোড় নেয় এবং তা দীর্ঘ ২১ বছর পর্যন্ত চলে। জনগণের ভোটের অধিকার, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমার দীর্ঘ সংগ্রাম সহজ ছিল না। বরং নিরলস প্রচেষ্টা ও আল্লাহ'র রহমতে আমি ১৯৯৬ সালে গণতন্ত্র ও জনগণের ভোটের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সফল হই। তাই ফিলিস্তিনি মহিলা ও শিশুদের জন্য আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। অতীতে আমি যা ভোগ করেছি, সে যন্ত্রণাই এখন তারা ভোগ করছেন। সেজন্য ফিলিস্তিন প্রশ্নে আমাদের ইসলামি উম্মাকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ ও বলিষ্ঠ হতে হবে।

ফিলিস্তিনি শান্তি চুক্তি এবং বসনিয়া, হারজেগোভিনা ও কসোভো সম্পর্কিত চুক্তিসমূহ বাস্তবায়নের ধীর গতিতে আমরা উদ্বিগ্ন। আজার বাইজানের বিরুদ্ধে আর্মেনিয়ার অব্যাহত আগ্রাসন ও উপসাগর অঞ্চলে উত্তেজনার কারণে বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের অবর্ণনীয় দুঃখ ও যন্ত্রণা আমাদের ব্যথিত করে। আমাদের ওআইসিভুক্ত আফগানিস্তান, সোমালিয়া, সিয়েরা লিওন ও সুদানের সংঘর্ষ নিরাপরাধ মানুষের জন্য খুবই মর্মান্তিক বিষয়। আমরা সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে আলোচনার মাধ্যম সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানাই। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে শান্তি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় সক্রিয় সহযোগীতা ও সমর্থন দেবে।

শান্তি ও উন্নয়নের মূল চাবি হচ্ছে নিরস্ত্রীকরণ। বাংলাদেশ পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ বিশেষ করে পরমাণু অস্ত্র ধ্বংসের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনপিটি ও সিটিবিটি স্বাক্ষর ও অনুমোদন করেছে। এইক্ষেত্রে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব। বিশ্বের শিশুদের জন্য ২০০০ সালকে আন্তর্জাতিক শান্তি সংস্কৃতির বছর এবং ২০০১ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সময়কে আন্তর্জাতিক শান্তি সংস্কৃতি ও অহিংসার দশক হিসেবে ঘোষণাসংকলিত জাতিসংঘ প্রস্তাবকে বাংলাদেশ স্বাগত জানায়। আমরা কোরআনের নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে শান্তি সংস্কৃতির উন্নতি বিধানে একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার জন্য ওআইসির সকল সদস্যের প্রতি আহ্বান জানাই। মাত্র দুমাস আগে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ শীর্য সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ নিউ ইয়র্কে সমবেত হয়েছিলেন। আমাদের অনেকেই তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা সেখানে একত্রিতভাবে সমগ্র মানবজাতির একটি শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য একটি সহস্রাব্দ ঘোষণা প্রণয়ন করি। আসুন, আমরা এই ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যসমূহ ইসলামি বিশ্বে অর্জনের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি।

বর্তমান বিশ্বায়ন ও উদারহরণের এই যুগ সকল দেশের জন্য নতুন নতুন অভাবনীয় সুযোগ এনে দিয়েছে। একই সঙ্গে নতুন চ্যালেঞ্জ ও বিপত্তির ও উদ্ভব হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলো তাদের অপর্যাপ্ত সম্পদের কারণে অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বঞ্চনা মোকাবেলা করছে। পরিবর্তিত সময়ের সাথে টিকে থাকতে তাদরে জন্য প্রযুক্তির প্রয়োজন। উন্নয়নশীল দেশের ৪০ শতাংশই ওআইসি'র সদস্য। তাদের স্বার্থ সুরক্ষায় এই সংস্থার আরো উদ্যোগী হওয়া উচিত। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার অধীনে বাণিজ্যিক ব্যবস্থায়

বাজার সেবা উন্মুক্তকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কাঁচামাল ও পুঁজির মুক্ত প্রবাহের দিকে ব্যাপকভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে আমরা উৎপাদনের আরেকটি উপাদান শ্রমিকের অবাধ চলাচলের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। শ্রমিকের অবাধ চলাচল নিশ্চিত না করা গেলে উন্নয়ন সুষম হতে পারে না। আমরা দক্ষ, আধা দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের যেখানে প্রয়োজন সেখানে অবাধে যাতায়াতের ওপর অবশ্যই গুরুত্ব দেব।

উন্নয়শীল মুসলিম দেশগুলোতে দারিদ্র্য নিঃসন্দেহে সবচেয়ে মারাত্মক উদ্বেগের কারণ। এই অভিশাপকে মোকাবেলার বাস্তবমুখী পথ হচ্ছে প্রাথমিক, গণ ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ব্যাপক বিনিয়োগের মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো। ছোটখাটো ব্যবসার জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান এবং উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা, পুষ্টি এবং দুঃস্থ জনগণের কল্যাণে সহায়ক সম্পদের প্রয়োজন। বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণের কয়েকটি অত্যন্ত উদ্ভাবনীমূলক ও সফল প্রয়োগ প্রমাণ করেছে, যা বিশ্বের বহু অঞ্চলে অনুসরণ করা হয়। আমরা আশ্রয়হীন মানুষের জন্য ভাতা, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প এবং মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পেনশন স্কিম চালু করেছি। এই প্রসঙ্গে আমি আনন্দের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি যে, ঢাকায় অবস্থিত ইসলামি প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (আইআইটি) এখন একটি কৃতিত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব থেকে এখন ছাত্ররা এই আইআইটিতে আসছেন। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে আর্থিক অসুবিধার মধ্যে রয়েছে। দীর্ঘদিন যাবত চাঁদা বকেয়া পড়ে থাকার এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৪০ লাখ ডলারে। যে সব দেশ তাদের চাঁদা পরিশোধ করেছেন, আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই । আর যারা দেন নি তাদের সম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিশোধের জন্য আহ্বান জানাই।

আমরা সন্তোষের সঙ্গে লক্ষ করছি, যে কাতার একটি অভিন্ন ইসলামি বাজার প্রতিষ্ঠার ধারণাটিকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই ধারণার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে দেখার জন্য বিশেষজ্ঞদের একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে। আমি আশা করি, আমরা ভবিষ্যতে এই প্রকল্পের আওতায় উদ্বৃত্ত সম্পদপূর্ণ সদস্য দেশ থেকে অপর্যাপ্ত সম্পদের সদস্য দেশে উন্নয়ন তহবিল, জনশক্তি ও প্রযুক্তির মুক্তপ্রবাহ এবং রফতানির ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত সদস্য দেশসমূহ অন্যান্য দেশে অগ্রাধিকারভিত্তিক বাজার প্রবেশাধিকার লাভের সুযোগ পাবে।

বাংলাদেশের জাতির জনক বলেছিলেন, 'মানুষ যে মুহূর্তে পৃথিবীকে ধ্বংস করার শক্তি অর্জন করেছে, আমরা তখন ওআইসিতে সেইশক্তি কাজে লাগানোর আগে অতীতের চেয়ে আরো বেশি করে আমাদের প্রজ্ঞাকে ব্যবহার করবো। তবে তা সৃষ্টির জন্য, ধ্বংসের জন্য নয়, যুদ্ধ নয়, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, জনগণের দুর্ভোগকে না বাড়িয়ে বরং মানব কল্যাণকে এগিয়ে নেয়ার জন্য। তাই আজ আমি এখানে আমার সকল সহকর্মী ও ইসলামি উম্মার নেতৃবৃন্দকে মানব কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের ঐক্য ও সংহতি জোরদারের আহ্বান জানাই। ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা নিশ্চিতভাবে সকল সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ উতরে যেতে এবং ভবিষ্যতে সকলের জন্য একটি নিরাপদ ও সমৃদ্ধ বিশ্ব নিশ্চিত করতে পারি।

১৩ নভেম্বর '২০০০ ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ

অর্থনৈতিক বিনিয়োগ ও অংশীদারীত্ব

এই সেমিনার আয়োজনের জন্য আমি এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় ব্যবসায়ী সমিতি (ওএভি)-কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জার্মানী বাংলাদেশের পুরনো ব্যবসায়ী অংশীদার এবং আমাদের পণ্যের অন্যতম প্রধান আমদানিকারক। আমরা এ সম্পর্ককে আরো জোরদার এবং গতিশীল করতে চাই।

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল বিশ্বের অন্যতম প্রধান উন্মুক্ত অর্থনীতির দেশ। বাংলাদেশের বিনিয়োগ নীতিতে মুনাফা তুলে নেয়ার, সীমাহীন বিদেশী মালিকানার, কর অবকাশ এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞদের বসবাসের অনুমতির সুযোগ রয়েছে। এ সুযোগে বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত আমার ধারণা নিয়ে আমি আপনাদের সংগে মতবিনিময় করতে চাই। জার্মানী সব সময়ই আমাদের সত্যিকারের বন্ধু। আমি সমিতির সভাপতিকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই। কেননা তিনি বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। আজ এখানে আমাদের সংগে থাকার জন্যও আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জার্মানীর সংগে আমাদের চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে জার্মানীর সংগে আমাদের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। পূর্ব এশীয় ব্যবসায়ী পরিষদ গঠন বস্তুত বাংলাদেশের মত একটি দেশের প্রতি জার্মান ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর আগ্রহ বৃদ্ধির একটি সুস্পষ্ট প্রকাশ। এটি একটি শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য সম্পর্ক উন্নয়নের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার দিকে নিয়ে যাবে, যা আমাদের দু'দেশের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ককে শুধু বিকশিতই করবে না, আমাদের সার্বিক দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্থায়ী অবদানও রাখবে।

স্বাধীনতার পর থেকেই জার্মানী আমাদের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার। অতীতের বছরগুলোতে জার্মানী বাংলাদেশকে উন্নয়ন সহায়তা, খাদ্য সাহায্য এবং ত্রাণ সরবরাহ করে আসছে। গত মাসে জার্মানীর একটি উন্নয়ন দল বাংলাদেশ সফর করেছে এবং উন্নয়ন সহায়তার পরিমাণ বাড়িয়েছে। ১৯৯৮ এর প্রলয়ংকরী বন্যা মোকাবেলায় আমাদেরকে দেয়া জার্মান সহায়তার কথা আমরা গভীর কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করছি। এ সহায়তা পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বাসনের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন পূরণে আমার সরকারকে যথেষ্ঠ সাহায্য করেছে।

অতীতে আমরা প্রধানত দারিদ্র্য বিমোচন, জ্বালিন ও রেলওয়ে, কলকারখানা ও কৃষি,

মানব সম্পদ ও নারী উন্নয়ন, বেসরকারি কলকারখানার উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন পরিবেশ রক্ষা এবং ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা খাতে জার্মানীর সহায়তা পেয়েছি। বর্তমানে বাংলাদেশ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে বিভিন্ন সামাজিক খাতের উন্নয়ন আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ এখন অন্যতম নিম্ন হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দেশ। বাংলাদেশের উদ্ভাবিত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি উন্নত দেশগুলোকেও আগ্রহী করে তুলেছে। বর্তমানে বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও এই কর্মসূচি হুবহু অনুসরণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে বেশ কয়েকশ' এনজিও রয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশই দেশীয়। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান, নারীর ক্ষমতায়ন এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এসব এনজিও উন্নয়নের ধারায় চমৎকার অবদান রাখছে।

আমরা নিজের দেশে এবং আমাদের অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং নিরাপত্তা রক্ষায় সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। পার্বত্য অঞ্চলের ২০ বছরের বিদ্রোহ অবসানে সরকার ১৯৯৭ সালে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। একই বছরের ডিসেম্বরে আমরা ভারতের সঙ্গে ৩০ বছর মেয়াদী ঐতিহাসিক পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। এসব প্রচেষ্টা আঞ্চলিক শান্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে এবং আমাদের জন্য বয়ে এনেছে ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার।

বাণিজ্য খাতে তৈরি পোশাক এবং সোয়েটার আমাদের প্রধান রফতানী পণ্য। আপনারা জানেন, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্প থেকে শিশু শ্রম বিলোপের অগ্রপথিক, যা এখন অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ চেষ্টা করছে। বর্তমানে হাজার হাজার শিশু গার্মেন্টস শিল্পের বাইরে অবস্থান করছে। আইএলও সমর্থিত স্কুলগুলোতে বৃত্তির বিনিময়ে তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দাতাদের কাছ থেকে সাহায্য এবং অনুদান গ্রহণের কারণেই বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। তবে বাংলাদেশ অব্যাহতভাবে বিদেশী সহায়তা এবং অনুদানের ওপর নির্ভরশীল থাকতে চায় না। আমাদের জনগণ এখন নিজের পর্যাপ্ত সম্পদের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহারের এবং উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক খাতে অগ্রগতি সাধন করতে চায়।

কঠোর পরিশ্রমী জনগণই হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। আপনাদের অনেকেই বাংলাদেশ সফর করেছেন। আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে, আমাদের জনগণের প্রচণ্ড উদ্ভাবনী শক্তি রয়েছে। তারা প্রচুর সম্ভাবনাময় এবং কঠোর পরিশ্রমী। বিদেশে কর্মরত লোকদের কাছ থেকেই আমরা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার বিশাল অংশ পেয়ে থাকি। গত কয়েক বছর ধরে পোশাক শিল্পও এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। কিন্তু সত্যিকারের অগ্রগতি অর্জন করতে হলে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ভিত্তি ব্যাপকতর করা প্রয়োজন।

সাম্প্রতিক গ্যাস আবিষ্কার বাংলাদেশের জনগণের জন্য নতুন প্রত্যাশার সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের জনগণ লাভবান হবে এমন পদ্ধতিতে এখন এই প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান ও ব্যবহার জরুরী। আমার সরকার এ ব্যাপারে সচেতন এবং বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নে আমরা বেশকিছু দূরদর্শী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

বাংলাদেশে আরো বিদিশী বিনিয়োগ আকর্ষণে আমার সরকার লোভনীয় সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট এলাকার শিল্পগুলোর জন্য ৫ বছর এবং দেশের অন্যান্য এলাকার শিল্প-কারখানার জন্য ৭ বছর কর রেয়াত, মুনাফা ও লভ্যাংশ তুলে নেওয়া, উত্তোলনযোগ্য লভ্যাংশ নতুন করে বিনিয়োগ, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য স্থানীয় ব্যাংক থেকে চলতি মূলধন ঋণ গ্রহণ, রয়ালিটি ও কারিগরি ফি'র ওপর কর রেয়াত, বিদেশী ঋণ ও হস্তান্তরিত শেয়ার থেকে গৃহীত লাভের ওপর কর রেয়াত, তালিকাভুক্ত কলকারখানার বিদেশী টেকনিশিয়ানদের ৩ বছর পর্যন্ত আয়কর থেকে অব্যাহিত দান, বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরুর দিন থেকে বেসরকারি খাতের বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলোর জন্য ১৫ বছর আয়কর রেয়াত, বিদেশী টেকনিশিয়ানদের বেতনের ৫০ শতাংশ দেশে পাঠানো এবং শতকরা একশ' ভাগ রফতানীমুখী শিল্পের জন্য আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির ওপর শুল্ক আরোপ না করা।

জার্মানী থেকে আমার দেশে আরো বিনিয়োগ প্রয়োজন। আমাদের পরস্পরের স্বার্থে ভবিষ্যত উন্নয়নের জন্য এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করি। জার্মানীর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে আমাদের দু'দেশের মধ্যকার সম্পর্ক জোরদারে সাহায্য করছে। আমি আবারো বলছি আমাদের অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব ও বিনিয়োগ প্রয়োজন।

বর্ধিত বিদেশী বিনিয়োগ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ নিশ্চিত করবে এবং তা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা আনবে। সবাই এক বাক্যে স্বীকার করবেন যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় সকলের স্বার্থ রয়েছে।

জার্মানীতে বাংলাদেশী পণ্য রফতানীর প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। বহুখাত রয়েছে যেখানে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে কাজ করতে পারলে সকল অংশীদারেরই লাভ হবে। সফটওয়্যার থেকে পাদুকা শিল্প, বিমান থেকে টেলিযোগাযোগ এবং কৃষি বীজ উন্নয়ন পর্যন্ত সবকিছু উন্মুক্ত রয়েছে। এসব খাতে বিনিয়োগের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। আপনারা আসুন এবং বিনিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখুন। আমাদের জনগণ অতিথি পরায়ন। বাংলাদেশে এসে কিছু সময় ব্যয় করার জন্য আমি আপনাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। সংগে আপনাদের বন্ধু-বান্ধবদেরও নিয়ে আসুন এবং পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সরেজমিনে দেখুন। আপনারা নিজেরাই সবকিছু দেখতে এবং অনুভব করতে পারবেন। বাংলাদেশ আপনাদের সমর্থন ও সহযোগিতা চায়।

৭ ডিসেম্বর ২০০০ জার্মানীর হামবুর্গ শহরে ইস্ট এশিয়া এসোসিয়েশনের সেমিনারে প্রদত্ত ভাষণ

মানবাধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা

আমি আজকের এই মনোরম সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সুইজারল্যান্ডে এসে আমি চমৎকার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। প্রশান্ত পরিবেশ সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং আপনাদের উষ্ণ আতিথেয়তা আমাকে ও আমার প্রতিনিধিদলের সদস্যদের অভিভূত করেছে।

আমরা বাংলাদেশে সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের জন্য গর্ববোধ করি। আমাদের যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনের সময় থেকেই এই সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং এর পর থেকে এই সম্পর্কের গভীরতা ও মাত্রা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭১ সালে আমাদের মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য জেনেভায় বেশ কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। তার পরিবারের সদস্য হিসাবে আমি জানি যে জেনেভায় তার অবস্থান কালটি তিনি আনন্দেই কাটিয়েছিলেন। আপনাদের দেশের প্রতি তার মুগ্ধতা প্রকাশ করে বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরেই ঘোষণা করেন তিনি বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ডে পরিণত করতে চান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের মানুষের জন্য এমন একটি সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে প্রতিটি মানুষ শান্তি ও মর্যাদার সঙ্গে বাস করতে পারবেন। তার স্বপ্নের বাংলা হতো সবদিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্ম-মর্যাদা সম্পন্ন এবং আত্মানির্ভরশীল একটি দেশ যার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নীতির জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সম্মানিত হতে পারতো। কিন্তু তিনি তার স্বপ্ন পূরণ করতে পারেননি। কারণ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর একটি বিপথগামী দল তাকে আমার পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্যদের সঙ্গে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই ঘটনার পর জাতি অনেকগুলো অভ্যুত্থান, হত্যাকাণ্ড ও ষড়যন্ত্র প্রত্যক্ষ করে। জনগণকে তাদের ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করার পর আমরা জাতির জনকের স্ব-স্বীকৃত খুনীদের বিচারের জন্য হস্তান্তর বা ফেরৎ পাঠানোর জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানিয়েছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস মানবাধিকার ও মর্যাদাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনকারী দেশ সুইজারল্যান্ড অভিযুক্ত খুনীদেরকে আশ্রয় গ্রহণকারী দেশ থেকে বিচারের জন্য বাংলাদেশে নিয়ে আসার লক্ষ্যে আমাদের উদ্যোগে সহায়তা দিবে।

এই নৃশংস ঘটনার পর বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়। আমরা মানবাধিকারের প্রতি সম্মান ও গণতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে প্রায় ২১ বছর ধরে কঠিন সংগ্রাম করেছি। ১৯৯৬ সালে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আমরা একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে সক্ষম হই। এই নির্বাচনে আমাদের জনগণ কোন রকম ভয়ভীতি ছাড়াই তাদের ভোটাধিকার প্রদান করে। গত সাড়ে ৪ বছর ধরে আমরা আমাদের জনসংখ্যার সবচেয়ে অনগ্রসর ও দুঃস্থ অংশ বিশেষ করে নারী স্বার্থ ও শিশুদের দারিদ্র্য বিমোচন, অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জনগনের খাদ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

বাংলাদেশ ৭শ' বছর ধরে রাজনৈতিক ঐতিহ্য বহনকারী সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে যথেষ্ঠ মূল্য দেয়। জাতিসংঘের কয়েকটি সংস্থাও সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত এবং এসব সংস্থাও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সম্প্রতি আপনার বাংলাদেশ সফরকালেও আমরা পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ফলপ্রসূ মত বিনিময় করেছি। এছাড়া আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আপনার আনুষ্ঠানিক আলোচনা কালেও আমাদের দুটি বন্ধু প্রতিম দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও সমঝোতার নতুন পথ খুলে দিয়েছে।

আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে বাংলাদেশ ও সুইজারল্যান্ডের মধ্যে চমৎকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বিরাজ করছে। আমরা গণতন্ত্র শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে একটি অংশীদারিত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলেছি। আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয়ে অভিন্ন মত পোষণ করি এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামেও এক সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছি। বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার এই চেতনা অব্যাহত রাখা জরুরি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার সম্পর্ককে আরো জোরদার করার সুযোগ রয়েছে।

খুবই সন্তোষের বিষয় হচ্ছে যে বাংলাদেশ সুইজারল্যান্ডের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি উন্নয়ন সাহায্য লাভকারী দেশগুলোর অন্যতম। আমি আশা করি আমরা বাংলাদেশের জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং আমাদের উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য সুইজারল্যান্ডের কাছ থেকে আরো বাড়তি সহায়তা লাভ করতে থাকবো।

শিল্পগুলোতে আপনাদের চমৎকার ব্যবস্থাপনা আমাদের জন্য উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার উৎস। আমরা বাংলাদেশে এগুলোর অনুসরণ করতে চাই। বাংলাদেশে আপনার সফরকালে আমাদের দু দেশের মধ্যে 'বিনিয়োগের সুরক্ষা' সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আমি আশা করি এই চুক্তি সুইজারল্যান্ড থেকে ব্যাপক শ্রমিক নির্ভর শিল্পগুলো বাংলাদেশে পুনঃস্থাপনের জন্য উৎসাহ সৃষ্টি করবে এবং আমাদের দুটি দেশের কল্যাণের জন্য নতুন বিনিয়োগ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

আমরা বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ঐতিহ্যে এবং শান্তি ও উন্নয়নের অবিভাসতায় বিশ্বাসী। আমার সরকার আইনের শাসন মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ।

সর্বোপরি আমরা বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে দৃঢ় ও জোরদার করার জন্য কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা সংসদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেছি। জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এখন মন্ত্রীদের পরিবর্তে সংসদ সদস্যদের নিয়ে কাজ করছে। আমি মনে করি গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও শান্তি পরস্পরকে জোরদার করে এবং আমরা এগুলোর একটি ছাড়া অন্যটি অর্জন করতে পারি না।

বাংলাদেশে আমরা জনগণের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষাকারী আইনী প্রতিষ্ঠান ও নজির স্থাপন করতে চাই। মানবাধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা সমুন্নত রাখে এমন গণতান্ত্রিক সমাজের প্রয়োজনে বিরাজমান আইনসমূহের আধুনিকায়ন ও সেগুলোকে খাপ খাওয়ানোর লক্ষ্যে একটি নিরপেক্ষ আইন কমিশন গঠন করা হয়েছে। আমরা সামাজিক দিক থেকে গুত্বরুপূর্ণ নির্দিষ্ট কিছু বিষয় বিশেষ করে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ মোকাবেলায় কিছু নতুন আইন প্রণয়ন করেছি।

এছাড়া আমার সরকার দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাক্ষরতা, আশ্রয়ন, কর্মসংস্থান, পল্লী উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের মতো আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়েছে। আমরা আশ্রয়ন, আদর্শ গ্রাম, গ্রামে ফিরে যাও, একটি বাড়ি একটি খামার, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য, ছাত্রীদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। মহিলাদের জন্য ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরা আমাদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার নিম্নতম পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদে প্রথমবারের মতো প্রায় ১৪ হাজার মহিলা সদস্য নির্বাচিত করেছি।

এই অনুষ্ঠানে আমাকে যোগ যোগদানের জন্য আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি আশা করি আমার এই সফর আমাদের দুটি বন্ধুপ্রতিম দেশের মধ্যে আরো উন্নত সুসম্পর্ক ও সহযোগিতা জোরদার করতে অবদান রাখবে।

আমি এখন বাংলাদেশ-সুইজারল্যান্ড সহযোগিতার সম্পর্ক জোরদার লক্ষ্যে করার নৈশ ভোজে যোগ দেয়ার জন্য সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

বার্ণ-সুইজারল্যান্ড ৮ ডিসেম্বর ২০০০ সুইজারল্যান্ডের ফেডারেল কাউন্সিলর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ।

শান্তির কাঠামো বিনির্মানে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যতাকে জয় করতে হবে

মেকং নদীর তীরে অবস্থিত এই দৃষ্টিনন্দন ঐতিহাসিক নগরীতে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমাকে এবং আমার প্রতিনিধি দলের সদস্যদের যে উষ্ণ আতিথেয়তা আপনারা প্রদান করেছেন সেজন্য মান্যবর সামদেচ হুন সেন এবং কম্বোডিয়ার জনগণের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি কম্বোডিয়ার বন্ধুদের জন্য বয়ে এনেছি বাংলাদেশের জনগণের গভীর প্রীতি ও ভালবাসা।

বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মধ্যে রয়েছে অনেক মিল ও অভিন্নতা। সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ আমাদের এ দুই এশীয় দেশ। দক্ষিণ এশিয়া থেকে আগত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাভ 'আংকর-সংস্কৃতি'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাদের দুই সভ্যতার মাঝে সৃষ্টি করেছে এক স্থায়ী বন্ধন। এশিয়া মহাদেশ এবং বিশ্বের শান্তি, প্রগতি ও স্থিতিশীলতার সঙ্গে আমাদের দু'দেশের স্বার্থই প্রবলভাবে যুক্ত। বাংলাদেশ এবং কম্বোডিয়া উভয়েই সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী এবং এর ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য উদগ্রীব।

বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়া ব্যাপক মাত্রার গণহত্যার শিকার হয়েছে। কুখ্যাত খেমাররুজের হাতে নিহত হয়েছে ১০ লাখ কম্বোডিয় নাগরিক এবং ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রাণ দিয়েছে ৩০ লাখ বাঙালি।

আমরা গভীর আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করেছি কিভাবে কম্বোডিয়া তার গৃহযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞকে জয় করে ক্রমে দেশময় শান্তি, স্থিতিশীলতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছে। লাখ লাখ উদ্বাস্তু এবং গৃহযুদ্ধের শিকার জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনে কম্বোডিয়ার পরিকল্পনা ও কার্যক্রমসমূহ আমরা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি। কম্বোডিয়ায় জাতিসংঘের অন্তর্বতীকালীন কর্তৃপক্ষ (UNTAC) এবং শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পেরে গর্বিত। বাংলাদেশ থেকে পর্যবেক্ষক দল কম্বোডিয়ার নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য সে দেশ সফর করেছে। আমরা মনে করি, নির্বাচন গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের জন্য অত্যাবশ্যক।

আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম আর ১৯৭১ সালে গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দান করেন। আমাদের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক বর্বর ও নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে আমরা বঙ্গবন্ধুকে হারাই।

সেদিনের সে মর্মান্তিক ঘটনার মাধ্যমে বাঙালি জাতি হারিয়েছে সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতী সন্তানকে, যিনি সমগ্র বাঙালি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে তাদেরকে মুক্তি ও জাতিয়তাবাদের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেলেন। সেদিনের সে বর্বরোচিত ঘটনায় ব্যক্তিগতভাবে আমি হারিয়েছি আমার প্রাণপ্রিয় বাবা ও মাকে। হারিয়েছি আমার দুই ভাই ও তাদের নবপরিনীতা দুই বধূ এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে। মাত্র ১০ বছর বয়সের ছোট ভাইও রেহাই পায়নি ঘাতকের হাত থেকে। আমি এবং আমার একমাত্র ছোট বোন তখন বিদেশে থাকায় ঘাতকের হাত থেকে সেদিন বেঁচে গিয়েছিলাম।

দেশ ও জনগণের জন্য আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর ছিল মহৎ স্বপ্ন ও দূরদৃষ্টি। জাতির জনকের শাহাদতবরণের পর বিভিন্ন রকমের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও শঠতার মধ্যেও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। তাঁর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার পবিত্র দায়িত্ব আজ আমাদের ওপর অর্পিত হয়েছে। ১৯৭৫ সালে আগস্ট মাসে আমরা যে গণতান্ত্রিক আধিকার হারিয়েছিলাম তা পুনরুদ্ধার করতে আমাদের বেশ কয়েক বছর ধরে নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়েছে। আজ আমরা জাতির জনকের সুখী ও সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে বদ্ধপরিকর।

১৯৯৬ সালে আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে জাতিকে গণতন্ত্রের পথে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এবং জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের বাস্তবমুখী কর্মসূচী গ্রহণের ফলে মাথাপিছু গড় আয় ৩৮৬ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। সাক্ষরতার হার ১৯৯৬ সালে ছিল ৪৭ শতাংশ, আজ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৪ শতাংশ। দারিদ্রসীমার পর্যায় ৪৭ শতাংশ থেকে ৪৪ শতাংশ নেমে এসেছে। আমরা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, দারিদ্র্য বিমোচন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নসহ বিভিন্ন সামাজিক খাতের উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদান করেছি। আমাদের গৃহীত কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে আশ্রয়ণের মাধ্যমে গৃহহীনদের বাসস্থান ও জীবিকার সংস্থান করা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, গরিবের জন্য শিক্ষা, ক্ষুদ্র ঋণ, বয়স্ক ভাতা, দুস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা এবং সুনির্দিষ্ট দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম।

স্থিতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং তার সমতাভিত্তিক বন্টন আমদের লক্ষ্য। আমাদের জনগণের উদ্যোগী মনোভাবকে স্বীকৃতি দিয়ে আমরা প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে বেসকারি খাতকে উৎসাহ দিচ্ছি।

আমরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে বিগত কয়েক বছরে কম্বোডিয়ার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অবলোকন করছি। মহামহিম রাজা নরোদম সিহানুক- এর বিজ্ঞ ও যোগ্য নির্দেশনায় এবং আপনার শক্তিশালী নেতৃত্বে কম্বোডিয়া গৃহযুদ্ধ ও সহিংসতা থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে। আজ কম্বোডিয়ায় শান্তি, সম্প্রীতি এবং ন্যায় বিচার বিরাজমান। জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আমি আপনার প্রচেষ্টার সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করছি।

আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, আঞ্চলিক বিষয়সমূহ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী নিয়ে আমাদের অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা ও মতবিনিময়

হয়েছে। আমাদের দুই দেশে জাতিসংঘ, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহ (IDCS) এর স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সংস্থাসমূহ ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করে আসছে।

আমাদের উভয় দেশ নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। গত বছরের শেষ প্রান্তে বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়া উভয়ে নিজ নিয়ন্ত্রণ বহির্ভুত প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কারণে সংঘটিত বন্যার প্রকোপ কাটিয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় লিপ্ত ছিল। বিশ্বায়নের গতি এবং তথ্য প্রযুক্তি বয়ে এনেছে আশা ও সম্ভাবনা, তবে একই সঙ্গে ক্ষুদ্রতর অর্থনীতির জন্য, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহের জন্য তা বয়ে এনেছে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া এবং অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশ বিশ্বায়নের অসম প্রতিযোগিতায় পেছনে পড়ে থাকবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। যদিও এলডিসি-সমূহকে বিশ্বসম্প্রদায় স্বীকৃতি দিয়েছে এমন এক রাষ্ট্র গোষ্ঠী হিসেবে যাদের বিশেষ সহায়তার প্রয়োজন। কিন্তু অনুন্নত দেশসমূহের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে নাই। অর্থনীতির ব্যাপক কাঠামোগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে সাধিত সুদূরপ্রসারী নীতিমালার পরিমার্জন সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে আমাদের সার্বিক অবস্থা নিম্নগামীই রয়েছে।

আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যতদিন ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং অনুন্নয়নের বিরুদ্ধে মানবজাতি সংগ্রামে লিপ্ত থাকবে ততদিন পর্যন্ত শান্তির সুসংহত ও সুঠাম কোন কাঠামোই নির্মাণ সম্ভব হবে না। এটা স্পষ্ট যে আমাদের পরস্পর নির্ভরতার কারণে যেকোন দেশে, যেকোন স্থানে বিরাজমান দারিদ্র্য বিশ্বময় শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতি হুমকি হয়ে দেখা দেবে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমার এ সফর আমাদের দু'দেশের মধ্যকার সম্পর্ককে আরো শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করবে।

এখন আমি আপনাদের এই টোস্টে অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি মহামহিম রাজা ও রাণীর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং উত্তরোত্তর সুখস্বাচ্ছন্দ্য; মান্যবর সামদেচ হুন সেন এর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ূ এবং সাফল্য; কম্বোডিয়ার বন্ধুপ্রতীম জনগণের জন্য শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি এবং বাংলাদেশ এবং কম্বোডিয়ার মধ্যে চিরস্থায়ী বন্ধত্ব কামনা করছি।

কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আয়োজিত ভোজসভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ, ২১ জানুয়ারি ২০০১